কুরআনের মহত্ত্ব ও মর্যাদা
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
সংকলন ঃ হাফীযুর রহমান আহসান
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ মূসা

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৭৯

৩য় প্রকাশ

রজব	১৪৩০
আষাঢ়	১৪১৬
জুন	২০০৯

বিনিময় ঃ ১০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

كتابُ اللّٰه كے فضائل ومسائل -এর বাংলা অনুবাদ

QURANER MOHATTA O MORJADA by Sayiid Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 100.00 Only.

প্রসংগ কথা

মূল গ্রন্থটি পাঠ করার আগে কয়েকটি বিষয়ে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইঃ

[১] এটি মাওলানা মওদূদীর [র] নিজের সংকলিত কোনো মৌলিক হাদীস গ্রন্থ নয়, বরঞ্চ এটি বিখ্যাত "মিশকাত মাসাবীহ" গ্রন্থের "ফাদায়েলুল কুরআন" (কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা) অংশের ব্যাখ্যা।

[২] এই ব্যাখ্যাও মাওলানার নিজের হাতে লিখিত নয়। মাওলানা লাহোরে দারসে কুরআন ও দারসে হাদীস প্রদান করতেন। তাঁর এসব দারস সাপ্তাহিক 'আইন' 'এসিয়া' ও কাওসার পত্রিকায় সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হতো। এছাড়া অনেকে এগুলো টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে রেকর্ড করে নিতেন।

[৩] 'আইন' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট এবং টেপ রেকর্ডার থেকে এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন জনাব হাকীমুর রহমান আহসান (পাকিস্তান) বক্তৃতা আকারে পেশ করা দারসকে তিনি গ্রন্থাকারে সাজিয়েছেন। এজন্যে তাকে কিছু সম্পাদনার কাজও করতে হয়েছে। এর আগে তিনি মাওলানার 'রোযা' সংক্রান্ত হাদীসগুলোর দারসও গ্রন্থাকারে সংকলন করে প্রকাশ করেছেন।

[৪] মাদ্রাসা এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ যেভাবে ছাত্রদেরকে বিশেষ নিয়ম নীতি অনুসরণ করে দারস দিয়ে থাকেন, কিংবা কোনো মুহাদ্দিস যেভাবে হাদীসের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করে থাকেন, এখানে সে রকম নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। বরঞ্চ এখানে উপস্থিত শ্রোতাদের মানসিক যোগ্যতাকে সামনে রেখেই দারস পেশ করা হয়েছে।

[৫] একদিকে লিখিত গ্রন্থ এবং উপস্থিত শ্রোতাদের উপযোগী বক্তৃতা যেমন সমমানের হতে পারেনা, অপরদিকে পত্রিকার রিপোর্ট এবং টেপরেকর্ড থেকে বক্তৃতার সংকলন তৈরীর ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সর্বোপরি এ সংকলন তৈরী হওয়ার পর মাওলানা নিজে দেখে দিতে পারেননি। তাই এ গ্রন্থটিকে মাওলানার নিজ হাতে লেখা অন্যান্য গ্রন্থের মাপকাঠিতে বিচার করা ঠিক হবেনা।

[৬] এযাবত যে কথাগুলো বললাম, তাহলো গ্রন্থটি প্রণয়ন সংক্রান্ত। এখন বলতে চাই গ্রন্থটির উপকারিতার কথা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাধারণ পাঠকদের জন্যে গ্রন্থটি খুবই উপকারী প্রমাণিত হবে। এতে রয়েছে একদিকে হাদীস অধ্যয়নের উপকারিতা আর অপর দিকে রয়েছে সহজ সরল ব্যাখা লাভের উপকারিতা।

[৭] এই সংকলনটি যেহেতু পবিত্র কুরআন মজীদের মহত্ত্ব ও মর্যাদা বিষয়ক, সে কারণে আমরা এর প্রথম দিকে মাওলানার বিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআনের' ভূমিকা থেকে কুরআন সংক্রান্ত কিছু জরুরী কথা সংকলন করে দিয়েছি।

আল্লাহ তায়ালা এ গ্রন্থের সাহায্যে পাঠকমহলে পবিত্র কালামে পাকের মহত্ত্ব ও মর্যাদা অনুধাবনের তৌফিক দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
ডিরেক্টর
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা

সূচীপত্র

কুরআন ও কুরআনের মর্যাদা অনুধাবনের উপায়

কুরআন মজীদকে বুঝতে হলে প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে এ কিতাব নিজে এবং এর উপস্থাপক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, মূল বিষয় বিবৃত করেছেন তা গ্রহণ করতে হবে। এ মূল বিষয় নিম্নরূপঃ

১. সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও একচ্ছত্র শাসক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দান করেছেন জানার, বুঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার, নির্বাচন, ইচ্ছা ও সংকল্প করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দান করেছেন। এক কথায় মানুষকে এক ধরণের স্বাধীনতা (Autonomy) দান করে তাকে দুনিয়ায় নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত করেছেন।

২. মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় বিশ্ব জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মনে এ কথা দৃঢ় বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেনঃ আমিই তোমাদের এবং সমগ্র সৃষ্টিলোকের একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এই সাম্রাজ্যে তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নও, কারোর অধীনও নও এবং আমার ছাড়া আর কারোর তোমাদের বন্দেগী, পূজা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও নেই। দুনিয়ার এই জীবনে তোমাদেরকে কিছু স্বাধীন ক্ষমতা—ইখতিয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এটি আসলে তোমাদের জন্য পরীক্ষাকাল। এই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তোমাদের কাজগুলো যাচাই-বাছাই করে আমি সিদ্ধান্ত নেবো তোমাদের মধ্য থেকে কে সফল হলো এবং কে হলো ব্যর্থ। তোমাদের জন্য সঠিক কর্মনীতি একটিইঃ তোমরা আমাকে মেনে নেবে তোমাদের একমাত্র মাবুদ ও শাসক হিসেবে। আমি তোমাদের জন্য যে

বিধান পাঠাবো সেই অনুযায়ী তোমরা দুনিয়ায় কাজ করবে। দুনিয়াকে পরীক্ষাগৃহ মনে করে এই চেতনা সহকারে জীবন যাপন করবে যেন আমার আদালতে শেষ বিচারে সফলকাম হওয়াই তোমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য হয়। বিপরীত পক্ষে এর থেকে ভিন্নতর প্রত্যেকটি কর্মনীতি তোমাদের জন্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর। প্রথম কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমরা দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসলে আমি তোমাদের দান করবো চিরন্তন আরাম ও আনন্দের আবাস জান্নাত। আর দ্বিতীয় কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমাদের দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখেরাতে প্রবেশ কালে সেখানে জাহান্নাম নামক চিরন্তন মর্মজ্বালা, দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের গভীর গর্তে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে।

৩. এ কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানব জাতির দুই সদস্য (আদম ও হাওয়া) বিশিষ্ট প্রথম গ্রুপকে তিনি পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য বিধান দান করেন। এই বিধান অনুযায়ী তাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের এই প্রাথমিক বংশধররা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্ট হননি। আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে। তারা সত্যকে জানতেন। তাদেরকে জীবন বিধান দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর আনুগত্য (অর্থাৎ ইসলাম) ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরও আল্লাহর অনুগত বান্দাহ (মুসলিম) হিসেবে জীবন যাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনাচরণে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক জীবন পদ্ধতি (অর্থাৎ দীন) থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তারা এক সময় এই সঠিক জীবন পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানী প্ররোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথিবী ও আকাশের মানবিক ও অমানবিক এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্তাকে আল্লাহর সাথে তাঁর কাজ কারবারে শরীক করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের (আল ইল্‌ম) মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহ নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি (শরীয়ত) পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈরী করেছে যার ফলে আল্লাহর এই যমীন জুলুম নিপীড়নে ভরে গেছে।

৪. আল্লাহ যদি তাঁর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদেরকে জোর পূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে তা হতো মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতা দান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানব জাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামাঞ্জস্যশীল। সৃষ্টির প্রথম দিনথেকে তিনি যে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল এই যে, মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে কাজের মাঝখানে যেসব সুযোগ সুবিধে দেয়া হবে তার মধ্য দিয়েই তিনি তাকে পথ নির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানব জাতির মধ্য থেকে এমন একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এঁদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এঁদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন যাপনের সঠিক বিধান এঁদেরকে দান করে তিনি বনী আদমকে ভুল পথ থেকে এই সহজ সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।

৫. এঁরা ছিলেন আল্লাহর নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের আগমনের এ সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তাঁরা সবাই একই দীনের তথা জীবন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী। তাঁরা সবাই ছিলেন একই হেদায়াতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ—সংস্কৃতির যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের সবার একই মিশন ছিল। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এই দীন ও হেদায়াতের দিকে আহবান জানান। তারপর যারা এ আহবান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উম্মতে পরিণত করেন যাঁরা নিজেরা হন আল্লাহর আইনের অনুগত এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করার এবং তাঁর আইনের বিরুদ্ধাচারণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সব সময় দেখা গেছে মানব গোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উম্মতে

মুসলিমার অংগীভূত হয় তারাও ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোনো কোনো উম্মত আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়।

৬. সব শেষে বিশ্ব জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের পথভ্রষ্ট উম্মতদেরকেও তিনি আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হেদায়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার এবং এই দাওয়াত ও হেদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মতে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ যারা একদিকে আল্লাহর হেদায়াতের ওপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্য দিকে সমগ্র দুনিয়ায় সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে। এই দাওয়াত ও হেদায়াতের কিতাব হচ্ছে এই কুরআন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আল্লাহ এই কবিতাটি অবতীর্ণ করেন।

কুরআনের মূল আলোচ্য

কুরআন সম্পর্কিত এই মৌলিক ও প্রাথমিক কথাগুলো জেনে নেয়ার পর পাঠকের জন্য এই কিতাবের বিষয়বস্তু, এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ বিন্দু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়ে যায়।

এর বিষয়বস্তু মানুষ। প্রকৃত ও জাজ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ কিসে—এ কথাই কুরআনের মূল বিষয়বস্তু।

এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আপাত দৃষ্টি, আন্দাজ—অনুমান নির্ভরতা অথবা প্রবৃত্তির দাসত্ব করার কারণে মানুষ আল্লাহ, বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা, নিজের অস্তিত্ব ও নিজের পার্থিব জীবন সম্পর্কে যেসব মতবাদ গড়ে তুলেছে এবং ঐ মতবাদগুলোর ভিত্তিতে যে দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে যথার্থ জাজ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে তা সবই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং পরিণতির দিক দিয়ে তা মানুষের জন্য ধ্বংসকর। আসল সত্য তাই যা মানুষকে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করার সময় আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছিলেন। আর এই আসল সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য ইতিপূর্বে সঠিক কর্মনীতি নামে যে

দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতির আলোচনা করা হয়েছে তাই সঠিক, নির্ভুল ও শুভ পরিণতির দাবীদার।

এর চূড়ান্ত লক্ষ ও বক্তব্য হচ্ছে, মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বনের প্রতি আহবান জানানো এবং আল্লাহর হেদায়াতকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করা। মানুষ নিজের গাফলতি ও অসতর্কতার দরুন এগুলো হারিয়ে ফেলেছে এবং তার শয়তানী প্রবৃত্তির কারণে সে এগুলোকে বিভিন্ন সময় বিকৃত করার কাজই করে এসেছে।

এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কুরআন পাঠ করতে থাকলে দেখা যাবে এই কিতাবটি তার সমগ্র পরিসরে কোথাও তার বিষয়বস্তু, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং মূল লক্ষ ও বক্তব্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরে পড়েনি। প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার বিভিন্ন ধরনের বিষয়াবলী তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত আছে যেমন একটি মোতির মালার বিভিন্ন রংয়ের ছোট বড় মোতি একটি সূতোর বাঁধনে এক সাথে, একত্রে একটি নিবিড় সম্পর্কে গাঁথা থাকে। কুরআনে আলোচনা করা হয় পৃথিবী ও আকাশের গঠনাকৃতির, মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া—পদ্ধতি এবং বিশ্ব জগতের নিদর্শন সমূহ পর্যবেক্ষণের ও অতীতের বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর। কুরআনে বিভিন্ন জাতির আকীদা বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্মকান্ডের সমালোচনা করা হয়। অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা করা হয়। এই সাথে অন্যান্য আরো বহু জিনিসের উল্লেখও করা হয়। কিন্তু মানুষকে পদার্থ বিদ্যা, জীব বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন বা অন্য কোনো বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনে এগুলো আলোচনা করা হয়নি। বরং প্রকৃত ও জাজ্জ্বল্যমান সত্য সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূর করা, যথার্থ সত্যটি মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া, যথার্থ সত্য বিরোধী কর্মনীতির ভ্রান্তি ও অশুভ পরিণতি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং সত্যের অনুরূপ ও শুভ পরিণতির অধিকারী কর্মনীতির দিকে মানুষকে আহবান করাই এর উদ্দেশ্য। এ কারণেই এতে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা কেবলমাত্র ততটুকুই এবং সেই ভংগিমায় করা হয়েছে যতটুকু এবং যে ভংগিমায় আলোচনা করা হয় তার মূল লক্ষের জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজন মতো এসব বিষয়ের আলোচনা করার পর কুরআন সব সময় অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে। একটি সুগভীর ঐক্য ও একাত্মতা সহকারে তার সমস্ত আলোচনা 'ইসলামী দাওয়াত'—এর কেন্দ্র বিন্দুতে ঘুরছে......................।

কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি

কুরআন একটি অসাধারণ গ্রন্থ। দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ অসংখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআনের দিকে এগিয়ে আসে। এদের সবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোনো পরামর্শ দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই বিপুল সংখ্যক অনুসন্ধানীদের মধ্যে যারা একে বুঝতে চান এবং এ কিতাবটি মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের ভূমিকা পালন করে এবং তাকে কিভাবে পথ দেখায়—এ কথা জানতে চান—আমি কেবল তাদের ব্যাপারেই আগ্রহী। এই ধরনের লোকদের কুরআন অধ্যায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আমি এখানে কিছু পরামর্শ দেবো। আর এই সংগে সাধারণত লোকেরা এ ব্যাপারে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তারও সমাধান করার চেষ্টা করবো।

কোন ব্যক্তি কুরআনের ওপর ঈমান রাখুন আর নাই রাখুন তিনি যদি এই কিতাবকে বুঝতে চান তাহলে সর্ব প্রথম তাঁকে নিজের মন—মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং অনুকূল—প্রতিকূল উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চিন্তা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করতে হবে। এ কিতাবটি বুঝার ও হৃদয়ংগম করার নির্ভেজাল ও আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে এর অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। যারা মনের মধ্যে বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা পূর্বে রেখে এ কিতাবটি পড়েন তারা এর বিভিন্ন ছত্রের মাঝখানে নিজেদের চিন্তাধারাই পড়ে যেতে থাকেন। আসল কুরআনের সামান্য বাতাসটুকুও তাদের গায়ে লাগে না। দুনিয়ার যে কোনো বই পড়ার ব্যাপারেও এ ধরনের অধ্যয়ন রীতি ঠিক নয়। আর বিশেষ করে কুরআন তো এই ধরনের পাঠকের জন্য তার অন্তর্নিহিত সত্য ও গভীর তাৎপর্যময় অর্থের দুয়ার কখনোই উন্মুক্ত করে না।

তারপর যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান লাভ করতে চায় তার জন্য সম্ভবত একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু যে এর অর্থের গভীরে নামতে চায় তার জন্য তো দুবার পড়ে নেয়াও যথেষ্ট হতে পারে না। অবশ্যি তাকে বার বার পড়তে হবে। প্রতি বার একটি নতুন ভংগিমায় পড়তে হবে। একজন ছাত্রের মতো পেন্সিল ও নোটবই সাথে নিয়ে বসতে হবে। জায়গা মতো প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করতে হবে। এভাবে যারা কুরআন পড়তে প্রস্তুত হবে, কুরআন যে চিন্তা ও কর্মধারা উপস্থাপন করতে চায় তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাটা যেন তাদের সামনে ভেসে ওঠে—কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তাদের অন্ততপক্ষে দুবার এই কিতাবটি পড়তে হবে। এই প্রাথমিক অধ্যয়নের সময় তাদের কুরআনের সমগ্র বিষয়বস্তুর ওপর ব্যাপকভিত্তিক জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের দেখতে হবে, এই কিতাবটি কোন্ কোন্ মৌলিক চিন্তা পেশ করে এবং সে চিন্তাধারার ওপর কিভাবে জীবন ব্যবস্থার অট্টালিকার ভিত্ গড়ে তোলে? এ

সময়কালে কোনো জায়গায় তার মনে যদি কোন প্রশ্ন জাগে বা কোনো খট্‌কা লাগে, তাহলে তখনি সেখানেই সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং সেটি নোট করে নিতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে সামনের দিকে অধ্যয়ন জারী রাখতে হবে। সামনের দিকে কোথাও না কোথাও তিনি এর জবাব পেয়ে যাবেন, এরি সম্ভাবনা বেশী। জবাব পেয়ে গেলে নিজের প্রশ্নের পাশাপাশি সেটি নোট করে নেবেন। কিন্তু প্রথম অধ্যয়নের পর নিজের কোনো প্রশ্নের জবাব না পেলে ধৈর্য সহকার দ্বিতীয় বার অধ্যয়ন করতে হবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, দ্বিতীয়বার গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর কালেভদ্রে কোনো প্রশ্নের জাবাব অনুদঘাটিত থেকে গেছে।

এভাবে কুরআন সম্পর্কে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভংগী লাভ করার পর এর বিস্তারিত অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। এ প্রসংগে পাঠককে অবশ্যি কুরআনের শিক্ষার এক একটি দিক পূর্ণরূপে অনুবাধন করার পর নোট করে নিতে হবে। যেমন মানবতার কোন্ ধরনের আদর্শকে কুরআন পসন্দনীয় গণ্য করেছে অথবা মানবতার কোন্ ধরণের আদর্শ তার কাছে ঘৃণার্হ ও প্রত্যাখ্যাত—এ কথা তাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। এই বিষয়টিকে ভালোভাবে নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নেয়ার জন্য তাকে নিজের নোট বইতে একদিকে লিখতে হবে 'পসন্দনীয় মানুষ' এবং অন্যদিকে লিখতে হবে 'অপসন্দনীয় মানুষ' এবং উভয়ের নীচে তাদের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী লিখে যেতে হবে। অথবা যেমন, তাকে জানার চেষ্টা করতে হবে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং কোন্ কোন্ জিনিসকে সে মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক গণ্য করে—এ বিষয়টিকেও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আগের পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ নোট বইতে কল্যাণের জন্য 'অপরিহার্য বিষয় সমূহ' এবং'ক্ষতির জন্য অনিবার্য বিষয় সমূহ'—এই শিরোনাম দুটি পাশাপাশি লিখতে হবে। অতপর প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয় দুটি সম্পর্কে নোট করে যেতে হবে। এ পদ্ধতিতে আকিদা—বিশ্বাস, চরিত্র—নৈতিকতা, অধিকার, কর্তব্য, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, দলীয় সংগঠন—শৃংখলা, যুদ্ধ, সন্ধি এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে কুরআনের বিধান নোট করতে হবে এবং এর প্রতিটি বিভাগের সামগ্রিক চেহারা কি দাঁড়ায়, তারপর এসবগুলিকে এক সাথে মিলালে কোন্ ধরনের জীবন চিত্র ফুটে ওঠে, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।

আবার জীবনের বিশেষ কোনো সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে হলে এবং সে ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভংগী জানতে হলে সেই সমস্যা সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এই অধ্যয়নের

মাধ্যমে তাকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার মৌলিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে। মানুষ আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কি কি চিন্তা করেছে এবং তাকে কিভাবে অনুধাবন করেছে? কোন্ কোন্ বিষয় এখনো সেখানে সমাধানের অপেক্ষায় আছে? মানুষের চিন্তার গাড়ি কোথায় গিয়ে আটকে গেছে? এই সমাধানযোগ্য সমস্যা ও বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কোন বিষয় সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগী জানার এটিই সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর পথ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, এভাবে কোনো বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকলে এমন সব আয়াতের মধ্যে নিজের প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যাবে, যেগুলো ইতিপূর্বে কয়েকবার পড়া হয়ে থাকলেও এই তত্ত্ব সেখানে লুকিয়ে আছে একথা ঘুর্ণাক্ষরেও মনে জাগেনি।

কুরআনের প্রাণসত্তা অনুধাবন

কিন্তু কুরআন বুঝার এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে কাজ করার বিধান ও নির্দেশ নিয়ে কুরআন এসেছে কার্যত ও বাস্তবে তা না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কুরআনের প্রাণসত্তার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে না। এটা নিছক কোনো মতবাদ ও চিন্তাধারার বই নয়। কাজেই আরাম কেদারায় বসে বসে এ বইটি পড়লে এর সব কথা বুঝতে পারা যাবার কথা নয়। দুনিয়ার প্রচলিত ধর্ম চিন্তা অনুযায়ী এটি নিছক একটি ধর্মগ্রন্থও নয়। মাদ্রাসায় ও খানকাহে বসে এর সমস্ত রহস্য ও গভীর তত্ত্ব উদ্ধার করাও সম্ভব নয়। শুরুতে ভূমিকায় বলা হয়েছে, এটি একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। সে এসেই এক নীরব প্রকৃতির সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্জন ও নিঃসংগ জীবন ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আল্লাহ বিরোধী দুনিয়ার মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার কণ্ঠে যুগিয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি। যুগের কুফরী, ফাসেকী ও ভ্রষ্টতার পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে তাকে প্রচন্ড সংঘাতে লিপ্ত করেছে। সচ্চরিত্র সম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে প্রতিটি গৃহাভ্যন্তর থেকে খুঁজে বের করে এনে সত্যের আহ্বায়কের পতাকাতলে সমবেত করেছে। দেশের প্রতিটি এলাকার ফিতনাবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে সত্যানুসারীদের সাথে তাদের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তির আহ্বানের মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করে খিলাফতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছর ধরে এই কিতাবটি এই বিরাট ও মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেছে। হক ও বাতিলের এই সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর সংঘর্ষকালে প্রতিটি মনযিল ও প্রতিটি পর্যায়েই সে একদিকে ভাঙ্গার পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং অন্যদিকে পেশ করেছে গড়ার নকশা। এখন বলুন, যদি আপনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত এবং দীন ও কুফরীর সংগ্রামে অংশগ্রহণই না করেন, যদি এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের

মনযিল অতিক্রম করার সুযোগই আপনার ভাগ্যে না ঘটে, তাহলে নিছক কুরআনের শব্দগুলো পাঠ করলে তার সমুদয় তত্ত্ব আপনার সামনে কেমন করে উদঘাটিত হয়ে যাবে? কুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি নিজেই কুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজ শুরু করবেন এবং এই কিতাব যেভাবে পথ দেখায় সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে থাকবেন। একমাত্র তখনই, কুরআন নাযিলের সময়কালীন অভিজ্ঞতাগুলো আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। মক্কা, হাব্শা (বর্তমান ইথিয়োপিয়া, ও তায়েফের মনযিলও আপনি দেখাবেন। বদর ও ওহোদ থেকে শুরু করে হুনাইন ও তাবুকের মনযিলও আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মুখোমুখি হবেন। মুনাফিক ও ইহুদিদের সাক্ষাতও পাবেন। ইসলামের প্রথম যুগের উৎসর্গীত প্রাণ মুমিন থেকে নিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মুমিন পর্যন্ত সবার সাথেই আপনার দেখা হবে। এটা এক ধরনের 'সাধনা'। একে আমি বলি "কুরআনী সাধানা"। এই সাধনা পথে ফুটে ওঠে এক অভিনব দৃশ্য। এর যতগুলো মনযিল অতিক্রম করতে থাকবেন তার প্রতিটি মনযিলে কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরা আপনা আপনি আপনার সামনে এসে যাবে। তারা আপনাকে বলতে থাকবে—এই মনযিলে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেখানে এই বিধানগুলো এনেছিল। সে সময় অভিধান, ব্যাকারণ ও অলংকার শাস্ত্রীয় কিছু তত্ত্ব সাধকের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে কিন্তু কুরআন নিজের প্রাণসত্তাকে তার সামনে উন্মুক্ত করতে কার্পণ্য করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না।

আবার এই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের বিধানসমূহ, তার নৈতিক শিক্ষাবলী, তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধি বিধান এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে তার প্রণীত নীতি—নিয়ম ও আইনসমূহ বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না সে বাস্তবে নিজের জীবনে এগুলো কার্যকর করে দেখবে। যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের অনুসৃতি নেই সে তাকে বুঝতে পারবে না। আর যে জাতির সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান কুরআন বিবৃত পথ ও কর্মনীতির বিপরীত দিকে চলে তার পক্ষেও এর সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

কুরআনী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা

কুরআন সমগ্র বিশ্বমানবতাকে পথ দেখাবার দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে, একথা সবাই জানে। কিন্তু কুরআন পড়তে বসেই কোনো ব্যক্তি দেখতে পায়, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নাযিল হবার সমকালীন আরববাসীদেরকে লক্ষ করেই তার বক্তব্য পেশ করেছে। তবে কখনো কখনো মানব জাতি ও সাধারণ

মানুষকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে এমন সব কথা বলে যা আরববাসীদের রুচি–অভিরুচি, আরবের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ইতিহাস ও রীতিনীতির সাথেই সম্পর্কিত। এসব দেখে এক ব্যক্তি চিন্তা করতে থাকে, সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখাবার জন্য যে কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছিল তার মধ্যে সাময়িক, স্থানীয় ও জাতীয় বিষয়বস্তু ও উপাদান এত বেশী কেন? এ বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন না করার কারণে অনেকের মনে সন্দেহ জাগে; তারা মনে করেন, সম্ভবত এ কিতাবটি সমকালীন আরববাসীদের সংশোধন ও সংস্কারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী কালে জোরপূর্বক টানা হেঁচড়া করে তাকে চিরন্তনভাবে সমগ্র মানব জতির জন্য জীবন বিধান গণ্য করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি নিছক অভিযোগ হিসেবে নয় বরং বাস্তবে কুরআন বুঝার জন্য এ ধরনের অভিযোগ আনেন তাকে আমি একটি পরামর্শ দেবো। প্রথমে কুরআন পড়ার সময় সেই সমস্ত স্থানগুলো একটু দাগিয়ে রাখুন যেখানে কুরআন কেবলমাত্র আরবদের জন্য এবং প্রকৃতপক্ষে স্থান, কাল ও সময় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এমন আকীদা–বিশ্বাস, চিন্তা বা ভাবধারা অথবা নৈতিক বিধান বা কার্যকর নিয়ম কানুন উপস্থাপন করেছে। কুরআন একটি বিশেষ স্থানে একটি বিশেষ যুগের লোকদেরকে সম্বোধন করে তাদের মুশরিকী বিশ্বাস ও রীতি–নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং তাদেরই আশে পাশের জিনিসগুলোকে ভিত্তি করে তওহীদের পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ দাঁড় করায়–নিছক এতটুকু কথার ভিত্তিতে কুরআনের দাওয়াত ও তার আবেদন স্থানীয় ও সাময়িক, এ কথা বলা যথেষ্ট হবে না। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, শির্কের প্রতিবাদে সে যা কিছু বলে তা কি দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিটি শির্কের ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবে খাপ খেয়ে যায় না যেমন আরবের মুশরিকদের শির্কের সাথে খাপ খেয়ে গিয়েছিলো? সেই একই যুক্তি প্রমাণগুলোকে কি আমরা প্রতিটি যুগের ও প্রতিটি দেশের মুশরিকদের চিন্তার পরিশুদ্ধি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি না? আর তওহীদের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনী প্রমাণ পদ্ধতিকে কি সামান্য রদবদল করে সব সময় ওসব জায়গায় কাজে লাগানো যেতে পারে না? জবাব যদি ইতিবাচক হয়ে থাকে, তাহলে একটি বিশ্বজনীন শিক্ষা কেবল মাত্র একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করে দান করা হয়েছিল বলেই তাকে স্থানীয় ও সাময়িক বলার কোনো কারণই থাকতে পারে না। দুনিয়ায় এমন কোন দর্শন, জীবন–ব্যবস্থা ও চিন্তা দর্শন নেই যার প্রথম থেকে নিয়ে শেষ অবধি সমস্ত কথাই বস্তু নিরপেক্ষ (Abstract) বর্ণনা ভংগীতে পেশ করা হয়েছে। বরং কোনো একটি বিশেষ অবস্থা বা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে তার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। এধরণের পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও তা

নিছক কাজীর গরুর মতো খাতাপত্রেই থাকবে, গোয়ালে তার নাম নিশানাও দেখা যাবে না। কাজেই মানুষের জীবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে তার পক্ষে কোনো বাস্তব বিধানের রূপ নেয়া কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

তাছাড়া কোনো চিন্তামূলক, নৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে চাইলে তার জন্য আদৌ এর কোনো প্রয়োজন নেই। বরং যথার্থই বলতে হয়, শুরু থেকেই তাকে আন্তর্জাতিক বানাবার চেষ্টা করা তার জন্য কল্যাণকরও নয়। আসলে তার জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পন্থা একটিই। এই আন্দোলনটি যেসব চিন্তাধারা, মতবাদ ও মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের জীবনের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাকে পূর্ণ শক্তিতে সেই দেশেই পেশ করতে হবে যেখান থেকে তার দাওয়াতের সূচনা হয়েছে। সেই দেশের লোকদের মনে এই দাওয়াতের তাৎপর্য অংকিত করে দিতে হবে, যাদের ভাষা, স্বভাব, প্রকৃতি, অভ্যাস ও আচরণের সাথে আন্দোলনের আহ্বায়ক নিজে সুপরিচিত। তারপর তাঁকে নিজের দেশেই ঐ মূলনীতিগুলো বাস্তবায়িত করে তার ভিত্তিতে একটি সফল জীবনব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। তবেই তো দুনিয়ার অন্যান্য জাতিরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে তাকে অনুধাবন করতে ও নিজের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে। কাজেই কোনো চিন্তা ও কর্মব্যবস্থাকে প্রথমে শুধুমাত্র একটি জাতির সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র তাদেরকেই বুঝাবার ও নিশ্চিন্ত করার জন্য যুক্তি প্রদর্শনের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল বলেই তা নিছক একটি জাতীয় দাওয়াত ও আন্দোলন—একথা বলার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে একটি জাতীয় ও একটি আন্তর্জাতিক এবং একটি সাময়িক ও একটি চিরন্তন ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিশেষত্বগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ

জাতীয় ব্যবস্থা হয় একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য বা তার বিশেষ অধিকারসমূহের দাবীদার। অথবা তার নিজের মধ্যে এমন কিছু নীতি ও মতাদর্শ থাকে যা অন্যান জাতির মধ্যে ঠাঁই পেতে পারে না। বিপরীত পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় সকল মানুষের মর্যাদা হয় সমান, তাদের সমান অধিকার দিতেও সে প্রস্তুত হয় এবং তার নীতিগুলোর মধ্যেও বিশ্বজনীনতার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে একটি সাময়িক ব্যবস্থা অবশ্যি এমন কিছু নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যেগুলো কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সমস্ত কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। আর এর বিপরীত পক্ষে একটি চিরন্তন ব্যবস্থার নীতিগুলো সব রকমের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খেয়ে চলে। এই বৈশিষ্টগুলো দৃষ্টির সামনে রেখে

যদি কোনো ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করেন বা যে বিষয়গুলোর কারণে সত্যি সত্যিই কুরআন উপস্থাপিত ব্যবস্থাকে সামটীক বা জাতীয় হবার ধারণা পোষণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি পুরো পুরি ব্যর্থ হবেন, এতে সন্দেহ নেই।

পূর্ণাংগ জীবন বিধান

কুরআন সম্পর্কে একজন সাধারণ পাঠকও শুনেছেন যে, এটি একটি বিস্তারিত পথ নির্দেশনা, জীবন বিধান ও আইন গ্রন্থ। কিন্তু কুরআন পড়ার পর সেখানে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা ও বিধি–বিধানের সন্ধান সে পায় না। বরং সে দেখে নামায ও যাকাতের মতো গুরত্বপূর্ণ ফরযও, যার ওপর কুরআন বার বার জোর দিয়েছে, তার জন্যও এখানে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান বিস্তারিতভাবে দান করা হয়নি। কাজেই এ কিতাবটি কোন্ অর্থে একটি পথ নির্দেশনা ও জীবন বিধান তা বুঝতে মানুষ অক্ষম হয়ে পড়ে। পাঠকের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

সত্যের একটি দিক মানুষের দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে যাওয়ার কারণেই এ ব্যাপারে যাবতীয় সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ কেবল এই কিতাবটি নাযিল করেন নি, তিনি এই সাথে একজন পয়গম্বরও পাঠিয়েছেন। আসল পরিকল্পনাটাই যদি হতো লোকদের হাতে কেবলমাত্র একটি গৃহনির্মাণের নক্শা দিয়ে দেয়া এবং তারপর তারা সেই অনুযায়ী নিজেদের ইমারতটি নিজেরাই বানিয়ে নেবে, তাহলে এ অবস্থায় নিঃসন্দেহে গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত ছোট বড় প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের হাতে দিয়ে দিতে হতো। কিন্তু গৃহ নির্মাণের নির্দেশের সাথে সাথে যখন একজন ইঞ্জিনীয়ারও সরকারীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ঐ নির্দেশ অনুযায়ী একটি ইমারতও তৈরী করে ফেলেন তখন ইঞ্জিনীয়ার ও তাঁর নির্মীত ইমারতটিকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নক্শার মধ্যে সমগ্র ছোট বড় খুঁটি নাটি বিষয়ের বিস্তারিত চিত্র সন্ধান করা এবং সেখানে তা না পেয়ে নক্শাটার বিরুদ্ধে অসম্পূর্ণতার অভিযোগ আনা কোনোক্রমেই সঠিক হতে পারেনা। কুরআন খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কোনো কিতাব নয়। বরং এই কিতাবে মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়গুলোই উপস্থাপিত হয়েছে। এর আসল কাজ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তিগুলোর কেবল পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপনাই নয় বরং এই সংগে বৈজ্ঞানিক যুক্তি–প্রমাণ ও আবেগময় আবেদনের মাধ্যমে এগুলোকে প্রচণ্ড শক্তিশালী ও দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করা। অন্যদিকে ইসলামী জীবনধারার বাস্তব কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে কুরআন মানুষকে জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত নীতি–নিয়ম ও

আইন–বিধান দান করে না বরং জীবনের প্রতিটি বিভাগের চৌহদ্দি বাতলে দেয় এবং সুস্পষ্টভাবে এর কয়েকটি কোণে নিশান ফলক গেঁড়ে দেয়। এ থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর গঠন ও নির্মাণ কোন্ পথে হওয়া উচিত, তা জানা যায়। এই নির্দেশনা ও বিধান অনুযায়ী বাস্তবে ইসলামী জীবধারার কাঠামো তৈরী করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ ছিল। দুনিয়াবাসীদের সামনে কুরআন প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি চরিত্র এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব আদর্শ উপস্থাপন করার জন্যই তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

[তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা থেকে]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা

١. عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যদের তা শিক্ষা দেয়–সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম–(বুখারী)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি নিজে সর্ব প্রথম কুরআন থেকে হেদায়াত লাভ করে, অতপর আল্লাহর বান্দাদের কাছে তা পৌছানোর দায়িত্ব পালন করে–তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম মানুষ।

কুরআনের শিক্ষাদান দুনিয়ার সর্বোত্তম ধন–সম্পদের চেয়েও অধিক উত্তম

٢. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَ نَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَّغْدُ وَكُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوِالْعَقِيْقِ فَيَأْتِىَ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِىْ غَيْرِ اِثْمٍ وَلَاقَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّنَا نُحِبُّ ذَالِكَ ! قَالَ اَفَلَا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ اَوْ يَقْرَاُ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِ هِنَّ مِنَ الْاَبِلِ-

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (তাঁর হুজরা থেকে) বেরিয়ে আসলেন আমরা তখন সুফফায় ছিলাম। তিনি বললেনঃ তোমাদের কে এটা পছন্দ করে যে, সে প্রতিদিন বোত্‌হান অথবা আকীকে যাবে এবং উচ্চ কুঁজ বিশিষ্ট দুটি উট নিয়ে আসবে কোনরূপ অপকর্ম অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়াই? আমরা সবাই বললাম। হে আল্লাহর রসূল! আমাদের প্রত্যেকেই এটা পছন্দ করে। তিনি বললেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি মসিজিদে যাবে এবং আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত লোকদের শিক্ষা দেবে অথবা পাঠ করবে, তার এ কাজ প্রতিদিন দুটি করে উট লাভ করার চেয়েও অধিক মূল্যবান। যদি সে তিনটি আয়াত শিক্ষা দেয় অথবা পড়ে তাহলে এটা তিনটি উট লাভ করার চেয়ে উত্তম। এভাবে চারটি আয়াত চারটি উট লাভ করার চেয়ে উত্তম। এভাবে যতগুলো আয়াত শিখানো হবে অথবা পড়বে তত সংখ্যক উট লাভ করার চেয়ে উত্তম –(মুসলিম)।

মসজিদে নববীর চত্বরকে সুফফা বলা হত। এর ওপরে ছাপড়া দিয়ে তা মসজিদের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। মক্কা মুআযযমা এবং আরবের অন্যান্য এলাকা থেকে যেসব মুসলমান হিজরাত করে মদীনায় এসেছিলেন তারাই এখানে অবস্থান করতেন। তাদের কোন বাড়ি–ঘরও ছিলনা এবং আয় উপার্জনও ছিলনা। মদীনার আনসারগণ এবং অপরাপর মুহাজিরগণ যে সাহায্য করতেন তাতেই তাদের দিন চলত। এসব লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে সারাক্ষণ উপস্থিত থাকতেন। বলতে গেলে তারা ছিলেন একটি স্থায়ী আবাসিক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র।

বোত্‌হান এবং আকীক মদীনা তাইয়্যেবার সাথে সংযুক্ত দুটি উপত্যকার নাম। একটি মদীনার দক্ষিণ পাশে এবং অপরটি উত্তর–পশ্চিম পাশে অবস্থিত ছিল। এই দুটি উপত্যকা এখনো বর্তমান আছে। তৎকালে এই দুই স্থানে উটের বাজার বসত। হুজুর (স) অর্থহীন, সম্পদহীন সুফফাবাসীদের সম্বোধন করে বললেন, ভাই! তোমাদের কে দৈনিক বোত্‌হান এবং আকীকে গিয়ে উচ্চ কুঁজ বিশিষ্ট দুটি করে উট বিনামূল্যে নিয়ে আসতে চায়? তারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের প্রত্যেকেই তা ভালবাসবে। অতপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ অপরকে কুরআনের দুটি আয়াত শিক্ষা দিলে তা বিনা মূল্যে দুটি উৎকৃষ্ট উট লাভ করার চেয়েও উত্তম। এভাবে সে যতগুলো আয়াত কাউকে শিক্ষা দিবে তা তত পরিমাণ উট পাওয়ার চেয়ে উত্তম বিবেচিত হবে।

লক্ষ্য করুণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কি রকম অসাধারণ ছিল। তিনি জানতেন, এই সূফফাবাসীরা শুধু এ কারণে নিজেদের

বাড়ি–ঘর পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন যে, তারা আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং পার্থিব সুযোগ–সুবিধাকে তারা মোটেই পছন্দ করতেন না। তাদেরকে বাধ্য হয়ে নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। শয়তান তাদের এই নিসম্বল অবস্থার সুযোগ নিতে পারে এই আশংকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সুকৌশলে তাদের চিন্তাধারার মোড় ঘুড়িয়ে দিলেন। এবং বললেন, তোমরা যদি আল্লাহর বান্দাদের কুরআন পাঠ করে শুনাও এবং তাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দাও তাহলে এটা তোমাদের হাতে বিনামূল্যে উট এসে যাওয়ার চেয়েও অধিক উত্তম। তোমরা যদি অন্যদের কাছে গিয়ে তাদেরকে কুরআনের দুটি আয়াত শিখিয়ে দাও তাহলে এটা বিনা মূল্যে দুটি ভাল উট লাভ করার চেয়ে অনেক কল্যাণকর। যদি তাদেরকে তিনটি আয়াত শিখিয়ে দাও তাহলে এটা তিনটি উট লাভ করার চেয়েও অধিক কল্যাণকর। এভাবে তাদের মন–মগজে এ কথা বসিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর দীনের ওপর ঈমান এনে থাক এবং এই দীনের খাতিরেই হিজরাতের পথ বেছে নিয়ে এখানে এসে থাক তাহলে এখন সেই দীনের কাজেই তোমাদের সময় এবং শ্রম ব্যায়িত হওয়া উচিত যে জন্য তোমরা বাড়ি–ঘর ছেড়ে চলে এসেছ। তোমরা দুনিয়াকে পাওয়ার আকাংখা করার পরিবর্তে বরং তোমাদের সময় দীনের কাজে ব্যয় হওয়া উচিত। এতে আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকবে এবং আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করে এবং তাঁর বান্দাদের সত্য–ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দিয়ে তোমরা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভের অধিক উপযোগী হতে পারো।

এসব লোককেই তাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কারণে আল্লাহ তায়ালা পার্থিব জীবনেই বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক বানিয়ে দিলেন। তারা নিজেদের জীবনেই দেখে নিলেন যে, মানুষ যদি ধৈর্য সহকারে আল্লাহর দীনের পথ অবলম্বন করে তাহলে এর ফল কি হয়।

কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ اَنْ يَّجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ، قُلْنَا نَعَمْ قَالَ ثَلَاثُ اٰيَاتٍ يَّقْرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নিজ বাড়িতে ফিরে গিয়ে তার ঘরে তিনটি মোটা তাজা এবং গর্ভবতী উষ্ট্রী পেতে কি পছন্দ করে? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেনঃ তোমাদের কারো নামাযে কুরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করা তিনটি মোটাতাজা ও গর্ভবতী উষ্ট্রীর মালিক হওয়ার তুলনায় অধিককল্যাণকর–(মুসলিম)।

মোটাতাজা ও গর্ভবতী উষ্ট্রী আরবদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হত। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে উদাহরণ পেশ করে বলেছেন, যদি তোমরা নামাযের মধ্যে কুরআনের তিনটি আয়াত পাঠ কর তবে তা তোমাদের ঘরে বিনামূল্যের তিনটি উট এসে হাযির হয়ে যাওয়ার চেয়ে অধিক কল্যাণকর। এই উদাহরণের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলমান সর্বসাধারণের মনে একথা বদ্ধমূল করে দিতে চেয়েছেন যে, কুরআন তাদের জন্য কত বড় রহমাতের বাহন এবং কুরআনের আকারে কত মূল্যবান সম্পদ তাদের হস্তগত হয়েছে। তাদের মনমগজে এই অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে যে, তাদের কাছে যেটা বড় থেকে বিরাটতর সম্পদ হতে পারে–কুরআন এবং এর একটি আয়াত তার চেয়েও অধিক বড় সম্পদ।

কুরআন না বুঝে পাঠ করলেও কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়

٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি, কুরআন লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত এবং পুতপবিত্র ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি, কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে যায় এবং অতি কষ্টে তা পাঠ করে তার জন্য দ্বিগুন পুরস্কার রয়েছে।–(বুখারী ও মুসলিম)

কুরআন মজীদেই বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই কুরআনকে মহাসম্মানিত এবং অতীব পবিত্র ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ করে থাকে। এজন্য বলা হয়েছে–যেব্যক্তি কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করে. এতে গভীর বুৎপত্তি সৃষ্টি করে এবং

এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করে সে এই ফেরেশতাদের সাথী হবে। এর অর্থ এই নয় যে, সে এই ফেরেশতাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এই ফেরেশতারা যে স্থান ও মর্যাদা লাভ করেছে তাকেও সেই মর্যাদা ও স্থানের অধিকারী করা হবে।

কোন কোন লোক এরূপ ধারণা করে যে, কুরআন শরীফ শুধু তিলাওয়াত করে আর কি ফায়দা–যদি সে তা না বুঝে পাঠ করে। কিন্তু এরূপ ধারনা পোষণ করা ঠিক নয়। কুরআন শরীফ শুধু তিলাওয়াত করাতেও অনেক ফায়দা আছে। যেমন আপনি দেখতে পাবেন, এমন অনেক গ্রাম্য প্রকৃতির লোক রয়েছে যার মুখের ভাষা পরিস্কার রূপে ফোটেনা। সে অনেক কষ্ট করে এবং মাঝে মাঝে আটকে যাওয়া সত্ত্বেও কুরআন পড়তে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কেও বলেছেন যে, তার জন্যও দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। একটি পুরস্কার কুরআন তিলওয়াত করার এবং অপরটি কুরআন পড়ার জন্য কষ্ট স্বীকার করার বা পরিশ্রম করার।

এখন কথা হল, না বুঝে কুরআন পাঠ করায় কি লাভ? এ প্রসংগে আমার প্রশ্ন হচ্ছে–আপনি কি পৃথিবীতে কখনো এমন কোন লোক দেখেছেন যে ইংরেজী বর্ণমালা পড়ার পর ইংরেজী ভাষার কোন বই নিয়ে পড়তে বসে গেছে এবং এর কিছুই তার বুঝে আসছেনা। চিন্তা করুণ, কোন ব্যক্তি কেবল এই কুরআনের সাথেই এরূপ পরিশ্রম কেন করে। সে আরবী বর্ণমালার প্রাথমিক বই নিয়ে কুরআন পাঠ শেখার অনুশীলন করে, শিক্ষকের সাহায্যে তা শেখার চেষ্টা করে, ধৈর্য সহকারে বসে তা পড়তে থাকে যদিও তার বুঝে আসেনা কিন্তু তবুও তা পড়ার চেষ্টা করতে থাকে–সে এটা শেষ পর্যন্ত কেন করতে থাকে? যদি তার অন্তরে ঈমান না থাকত, কুরআনের প্রতি তার বিশ্বাস না থাকত, সে যদি এটা মনে না করত যে, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তা পাঠে বরকত ও কল্যাণ লাভ করা যায়–তাহলে শেষ পর্যন্ত সে এই শ্রম ও কষ্ট কেন স্বীকার করে? পরিস্কার কথা হচ্ছে কুরআন আল্লাহর কালাম এবং কল্যাণময় প্রাচুর্যময় কালাম–এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়েই সে তা পাঠ করার জন্য কষ্ট স্বীকার করে। অতএব প্রতিদান না পাওয়ার কোন কারণই থাকতে পারেনা।

আবার এ কথা মনে করাও ঠিক নয় যে, এমন ব্যক্তির জন্য কুরআন শিক্ষা করা এবং তা বুঝার উপযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ নয়। এ চেষ্টা তাকে অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু যে লোক মনে করে যে, কুরআন যদি কারো বুঝে না আসে তবে তা পাঠ করা তার জন্য অনর্থক এবং মূল্যহীন। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কুরআন না–বুঝে পড়ার মধ্যেও নিশ্চিতই ফায়দা রয়েছে।

যার সাথে ঈর্ষা করা যায়

٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَحَسَدَ اِلاَّ عَلَى اثْنَيْنِ ، رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ـ

৫। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। এক, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিনরাত তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে (অর্থাৎ নামাযে দন্ডায়মান অবস্থায় তিলাওয়াত করছে অথবা তার প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে)। দুই, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ধনসম্পদ দান করেছেন এবং সে রাতদিন তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে।-(বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাাইহে ওয়া সাল্লাম ঈমানদার সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনায় যে কথা বসিয়ে দিয়েছেন, তা হচ্ছে-কোন ব্যক্তির পার্থিব উন্নতি, প্রাচুর্য এবং নামকাম কোন ঈর্ষার বস্তুই নয়। ঈর্ষার বস্তু কেবল দুই ব্যক্তি। এক, যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেছে এবং সে দিনরাত নামাযের মধ্যে তা পাঠ করার জন্য দন্ডায়মান থাকে, অথবা আল্লাহর বান্দাদের তা শেখানোর কাজে ব্যস্ত থাকে, তা শেখার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং এর প্রচার করে। দুই, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ধনসম্পদ দান করেছেন এবং সে তার অপচয় না করে, বিলাসিতায় ও পাপকাজে ব্যয় না করে বরং দিনরাত আল্লাহর নির্দেশিত পথে তা ব্যয় করে-এ ব্যক্তিও ঈর্ষার পাত্র।

এই সেই শিক্ষা যার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম লোকদের দৃষ্টিভংগির আমূল পরিবর্তন সাধন করেন এবং তাদেরকে নতুন মূল্যবোধ দান করেন। তিনি তাদেরকে বলে দিলেন, মর্যাদা ও গুরুত্ব দান করার মত জিনিস মূলত কি এবং মানবতার উচ্চতম নমুনাই বা কি যার ভিত্তিতে তাদের নিজেদের গঠন করার আকাংখা এবং প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ।

হাদীসের মূল পাঠে বিদ্বেষ শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে ঈর্ষা শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে-ঈর্ষা এমন একটি জিনিস যা হিংসা-বিদ্বেষের মত মানুষের মনে আগুন লাগিয়ে দেয় না। হিংসা-বিদ্বেষ (حسد) যদিও ঈর্ষারই

(رشك) একটি ভাগ কিন্তু তা এতটা তীব্র যে এর কারণে মানুষের মনে আগুনের মত একটি উত্তপ্ত জিনিস লেগেই থাকে। হাসাদ যেন এমন একটি গরম পাত্র যা প্রায়ই সারা জীবন মানুষের মনে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। এজন্য এখানে ঈর্ষার আবেগের তীব্রতা প্রকাশ করার জন্য হাসাদ (হিংসা) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

হাসাদের মধ্যে মূলত দোষের কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষ চায় অমুক জিনিসটি সে না পেয়ে বরং আমি পেয়ে যাই অথবা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হোক এবং আমাকে তা দেয়া হোক অথবা তা যদি আমার ভাগ্যে না জোটে তাহলে এটা যেন তারও হাতছাড়া হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে হাসাদের মূল অর্থ। কিন্তু এখানে হাসাদ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

এখানে কেবল ঈর্ষার অনুভূতির প্রখরতা ব্যক্ত করার জন্যই হাসাদ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মনে যদি ঈর্ষার আগুন লাগতেই চায় তাহলে এই উদ্দেশ্যেই লাগা উচিৎ যে, তোমরা দিনরাত কুরআন শেখা এবং শেখানোর কাজে ব্যাপৃত থাক। অথবা তুমি সম্পদশালী হয়ে থাকলে তোমার এই সম্পদ অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, রাতদিন সর্বদা আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্য, তাঁর দীনের প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য তা ব্যয় করতে থাক। এভাবে তুমি অন্যদের জণ্যও ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়ে যাও।

কুরআন মজীদের সাথে মুমিনের সম্পর্ক

٦.عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَّطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَّمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَايَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَارِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لَايَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَارِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَّطَعْمُهَا مُرٌّ –

(متفق عليه)

وفى رواية، اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَعْمَلُ بِهٖ كَالْاُتْرُجَّةِ وَالْمُؤْمِنُ لَايَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَعْمَلُ بِهٖ كَالتَّمْرَةِ –

৬। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে মুমিন কুরআন পাঠ করে সে কমলা লেবুর সাথে তুলনীয়। এর ঘ্রাণও উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন পাঠ করেনা সে খেজুরের সাথে তুলনীয়। এর কোন ঘ্রাণ নেই কিন্তু তা সুমিষ্ট। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করেনা সে মাকাল ফল তুল্য। এর কোন ঘ্রাণও নেই এবং এর স্বাদও অত্যন্ত তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে সে রাইহান ফুলের সাথে তুলনীয়। এর ঘ্রাণ সুমিষ্ট কিন্তু স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। –(বুখারী–মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছেঃ "যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে সে কমলা–লেবু সদৃশ। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেনা– কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করে সে খেজুর তুল্য।"

কুরআন মজীদের মর্যাদা ও মহানত্ব হৃদয়াংগম করানোর জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অর্থাৎ কুরআন মজীদ স্বয়ং একটি সুগন্ধি। মুমিন ব্যক্তি তা তিলাওয়াত করলেও এর সুগন্ধি ছড়াবে আর মুনাফিক ব্যক্তি পাঠ করলেও ছড়াবে।

অবশ্য মুমিন এবং মুনাফিকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে পার্থক্য তা ঈমান ও নিফাকের কারণেই হয়ে থাকে। মুমিন ব্যক্তি যদি কুরআন পাঠ না করে তাহলে তার সুগন্ধি ছড়ায় না, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব মিষ্টি ফলের মতই সুস্বাদু। কিন্তু যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করেনা তার সুগন্ধিও ছড়ায়না এবং তার ব্যক্তিত্ব তিক্ত এবং খারাপ স্বাদযুক্ত ফলের মত।

অপর এক বর্ণনায় আছে–যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে সে কমলা–লেবু ফল সদৃশ। আর যে মুমিন কুরআন পড়েনা কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে সে খেজুরের সদৃশ। উল্লেখিত দুটি বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, এক বর্ণনায় কুরআন তিলাওয়াত এবং এর ওপর ঈমান রাখার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর বর্ণনায় কুরআন তিলাওয়াত এবং তদনুযায়ী কাজ করার পরিনাম বর্ণনা করা হয়েছে। মৌলিক দিক থেকে উভয়ের প্রাণসত্তা একই।

কুরআন হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতি লাভের মাধ্যম

৭.عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ–

৭। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের (কুরআন) মাধ্যমে একদল লোককে উন্নত করবেন এবং অপর দলের পতন ঘটাবেন। –(মুসলিম)

এ হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে– যেসব লোক এই কিতাব নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের উন্নতি বিধান করবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের মস্তক সমুন্নত রাখবেন। কিন্তু যেসব লোক এই কিতাব নিয়ে অলস হয়ে বসে থাকবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবেন। অথবা যেসব লোক এই কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দেবেন। দুনিয়ায়ও তাদের জন্য কোন উন্নতি নেই এবং আখেরাতেও কোন সুযোগ–সুবিধা নেই।

কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে ফেরেশতারা সমবেত হয়

٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَاُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهٗ مَرْبُوْطَةٌ عِنْدَهٗ اِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ فَقَرَاَ فَجَالَتْ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ ثُمَّ قَرَاَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهٗ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِنْهَا فَاَشْفَقَ اَنْ تُصِيْبَهٗ وَلَمَّا اَخَّرَهٗ رَفَعَ رَأْسَهٗ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ اِقْرَاْ يَاابْنَ حُضَيْرٍ، اِقْرَاْ يَاابْنَ حُضَيْرٍ، قَالَ فَاَشْفَقْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

اَنْ تَطَأَ يَحْيٰ وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَانْصَرَفْتُ اِلَيْهِ وَرَفَعْتُ رَأْسِيْ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجْتُ حَتّٰى لاَ اَرَاهَا، قَالَ وَتَدْرِيْ مَاذَاكَ، قَالَ لاَ، قَالَ تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لاَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ اِلَيْهَا لاَتَتَوَارٰى مِنْهُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَفِيْ مُسْلِمٍ عَرَجَتْ فِي الْجَرِّ بَدَلَ فَخَرَجْتُ عَلٰى صِيْغَةِ الْمُتَكَلِّمِ)

৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। উসাইদ ইবনে হুদায়ের (রা) বলেন যে, তিনি এক রাতে নিজের ঘরে বসে নামাযের মধ্যে সূরা বাকারা পড়ছিলেন। তাঁর ঘোড়াটি নিকটেই বাধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি লম্ফ–ঝম্ফ শুরু করে দিল। তিনি যখন তিলাওয়াত বন্ধ করলেন ঘোড়াটি শান্ত হয়ে গেল। তিনি যখন পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করলেন ঘোড়াটিও আবার লাফঝাফ শুরু করে দিল। অতপর তিনি পাঠ বন্ধ করলেন। ঘোড়াটিও শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তিনি আবার কুরআন পড়া শুরু করলে ঘোড়াটিও দৌড়ঝাপ করতে লাগল। তিনি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে নিলেন। কারণ তার ছেলে ইয়াহইয়া ঘোড়ার নিকটেই ছিল। তার ভয় হল ঘোড়া হয়ত লাফঝাঁফ করে ছেলেকে আহত করতে পারে। তিনি ছেলেকে এর কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে আসমানের দিকে মাথা তুললেন। তিনি ছাতার মত একটি জিনিস দেখতে পেলেন এবং তার মধ্যে আলোকবর্তিকার মত একটি জিনিস দেখলেন। সকাল বেলা তিনি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেনঃ হে ইবনে হুদায়ের! তুমি পড়তে থাকলেনা কেন? হে ইবনে হুদায়ের! তুমি পড়তে থাকলেনা কেন? রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভয় হল ঘোড়াটি না আবার আমার ছেলে ইয়াহইয়াকে পদদলিত করে। কেননা সে এর কাছেই ছিল। আমি নামায শেষ করে সালাম ফিরিয়ে ছেলেটির কাছে গেলাম। আমি আসমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হঠাৎ দেখতে পেলাম–যেন একটি ছাতা এবং তার অভ্যন্তরে একটি আলোকবর্তিকা জ্বলজ্বল করছে।

আমি (ভয় পেয়ে) সেখান থেকে চলে আসলাম (অর্থাৎ খোলা আকাশের নীচ থেকে) যেন আমার দৃষ্টি পুনরায় সেদিকে না যায়। নবী (স) বললেনঃ তুমি কি জান এগুলো কি? তিনি বললেন, না। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এরা ছিল

ফেরেশতা। তোমার কুরআন পড়ার আওয়াজ শুনে তারা কাছে এসে গিয়েছিল। তুমি যদি তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতে তাহলে তারা ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করত এবং লোকেরা তাদের দেখে নিত কিন্তু তারা লোকচক্ষুর অন্তরাল হত না।।–(বুখারী–মুসলিম)

এটা কোন জরুরী কথা নয় যে, যখনই কোন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং সেও অনুরূপ ঘটনার সম্মুখীন হবে। স্বয়ং হযরত উসাইদ ইবনে হুদাইরের (রা) সামনে প্রত্যহ এরূপ ঘটনা ঘটতনা। তিনি তো সবসময়ই কুরআন পাঠ করতেন। কিন্তু এই দিন তার সামনে এই বিশেষ ঘটনাটি ঘটে–যে সম্পর্কে আমরা জানি না যে, তা কেন ঘটল। ইহা তাঁহার একটি বিশেষ "কারামত" যাহা সব সময় প্রকাশ পায় না। এ জন্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও তাকে বলেননি যে, তোমার সামনে হামেশাই এরূপ ঘটনা প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ প্রতিদিন রাতে তুমি যদি এভাবে কুরআন পাঠ করতে থাক তাহলে ভোরবেলা এরূপ ঘটনা ঘটবে যে, ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকবে আর লোকেরা তাদের দেখে নেবে। এর পরিবর্তে তিনি বলেছেন, পুনরায় যদি কখনো এরূপ ঘটে তাহলে তুমি নিশ্চিন্তে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকবে। এর মধ্যে কোন শংকার কারণ নেই।

কিন্তু অজকাল আমরা এরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি না কেন? আসল কথা হচ্ছে– আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের সাথে এরূপ ঘটনা ঘটান না। তিনি তাঁর প্রতিটি মাখলুক এমনকি প্রতিটি ব্যক্তির সাথে ভিন্ন ভিন্ন অচরন করে থাকেন। তিনি প্রতিটি ব্যক্তিকে সবকিছুই দেননি। আর এমন কেউ নেই যাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পন্থায় দিয়ে থাকেন।

কুরআন পাঠকারীর ওপর প্রশান্তি নাযিল হয়

৯. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَاِلٰى جَانِبِهٖ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوا وَجَعَلَ فَرَسُهٗ يَنْفِرُ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ –

৯। বারাআ ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল এবং তার নিকটেই একটি ঘোড়া দুটি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। এ সময় একটি মেঘখন্ড তার ওপর ছায়া বিস্তার করল এবং ধীরে ধীরে নীচে

নেমে আসতে লাগল। তা যত নীচে আসতে থাকল আর তার ঘোড়া ততই দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিল। যখন ভোর হল সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি বললেনঃ এটা হল প্রশান্তি যা কুরআনের সাথে নাযিল হচ্ছিল।—(বুখারী–মুসলিম)

পূর্ববর্তী হাদীসে উল্লেখিত ফেরেশতাদের পরিবর্তে এখানে প্রশান্তি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশান্তির পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা করা বড়ই কঠিন। কুরআন মজীদে বিভিন্ন জায়গায় 'সাকীনাহ' (প্রশান্তি) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার সেই রহমত ও অনুগ্রহ যা মানুষের মনে প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা ও শীতলতা সৃষ্টি করে এবং মানুষ আত্মিক দিক থেকে অনাবিল শান্তি অনুভব করে তার জন্য 'সাকীনাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি বিশেষ সাহায্য আসতে থাকে তবে তা বুঝানোর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অতএব এটা বলা মুশকিল যে, এ শব্দটি কি এখানে 'ফেরেশতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা আল্লাহর এমন কোন করুণা বুঝানো হয়েছে যা সেই ব্যক্তির নিকটতর হয়েছিল।

এরূপ ঘটনাও সবার ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় না এবং স্বয়ং ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব সময় ঘটেনি। এটা এমন একটি বিশেষ অবস্থা ছিল যা ঐ ব্যক্তির সামনে প্রতিভাত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যদি এর অর্থ ও তাৎপর্য বলে দেয়ার জন্য বর্তমান না থাকতেন তহলে ঐ ব্যক্তি সব সময় অস্থিরতার মধ্যে কালাতিপাত করত যে, তার সামনে এটা কি ঘটে গেল।

উল্লেখিত দুটি হাদীসেই এই বিশেষ অবস্থায় ঘোড়ার দৌড়ঝাপ ও লক্ষ–ঝম্পের কথা উল্লেখ আছে। আসল কথা হচ্ছে, কোন কোন সময় পশু–পাখী এমন সব জিনিস দেখতে পায় যা মানুষের চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। আপনারা হযতো একথা পড়ে থাকবেন যে, ভূমিকম্প শুরু হওয়ার পূর্বে পাখিরা লুকিয়ে যায়। চতুষ্পদ জন্তু পূর্বক্ষণেই জানতে পারে যে, কি ঘটতে যাচ্ছে। মহামারীর প্রাদূর্ভাব হওয়ার পূর্বেই কুকুর এবং অন্যান্য প্রাণী চীৎকার শুরু করে দেয়। এর মূল কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এগুলোকে এমন কিছু ইন্দ্রিয় শক্তি দান করেছেন যা মানবজাতিকে দেয়া হয়নি। এর ভিত্তিতে বাকশক্তিহীন প্রাণীগুলো এমন কতগুলো বিষয়ের জ্ঞান অথবা অনুভূতি লাভ করতে পারে যা মানুষের জ্ঞান অনুভূতির সীমা বহির্ভূত।

সুরা ফাতিহার ফযীলত

(১০) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْفِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ - فَقِيْلَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ * فَقَالَ اِقْرَأْبِهَا فِىْ نَفْسِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَّمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَا سَئَلَ * فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ * وَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ * فَاِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَ نِىْ عَبْدِىْ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ اِلَىَّ عَبْدِىْ * فَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَئَلَ * فَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَئَلَ * (مُسْلِمٌ كِتَابُ الصَّلٰوةِ - اَبُوْ دَاوُدَ وَصَلٰوة - تِرْمِذِىٌّ - تفسير سُوْرَةِ فَاتِحَةُ- نسائ ، افتتاح - ابن ماجه ، ادب - مسند احمد ج ٢ صفحه ٢٤١، ٢٨٥، ٤٦٠)

১০। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তি এমন নামায পড়ল, যার মধ্যে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করেনি– তার নামায ব্যর্থ ও মূল্যহীন থেকে যাবে।" (রাবী বলেন) এ কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। "তার নামায অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।" আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা যখন ইমামের পেছনে নামায পড়ব, তখন কি করব? তিনি জবাবে বললেন, তা মনে মনে পাঠ কর। কেননা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে

শুনেছিঃ "মহান আল্লাহ বলেন, আমি নামাযকে আমার এবং বান্দার মাঝে দুই সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। বান্দাহ যা চাইবে আমি তাকে তা দান করব। বান্দাহ যখন বলে, "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক), তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলে, আর-রাহমানির রহীম (তিনি দয়াময়, তিনি অনুগ্রহকারী), তখন মহামহিম আল্লাহ বলেন, বান্দাহ আমার মর্যাদা স্বীকার করেছে এবং আমার কাছে আত্মসমর্পন করেছে। বান্দাহ যখন বলে, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি), তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার এবং বান্দার মাঝে (অর্থাৎ বান্দাহ আমার ইবাদত করবে, আর আমি তার সাহায্য করব), আমার বান্দাহ যা চায় তা আমি দেব। যখন বান্দাহ বলে , ইহদিনাস সিরাতল মুস্তাকীম, সিরাতল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম অলাদদোয়াল্লীন (আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন, সেইসব বান্দাদের পথে যাদের আপনি নি'আমত দান করেছেন, যারা অভিশপ্তও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়), তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দাহ যা প্রার্থনা করেছে তা সে পাবে।" (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ

জামাআতে নামায পড়াকালীন সময়ে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে কিনা-এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, মুক্তাদীগণ চুপে চুপে ফাতিহা পাঠ করে নেবে। ইমাম শাফেঈর মতে মুক্তাদীকে সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে কোন অবস্থায়ই মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে, ইমাম ফাতিহা পাঠের শব্দ যদি মুক্তাদীদের কানে আসে, তাহলে তারা ফাতিহা পাঠ করবে না, বরং ইমামের পাঠ মনোযোগ সহকারে শুনবে। কিন্তু ইমামের ফাতিহা পাঠের শব্দ মুক্তাদীদের কানে না আসলে তারা ফাতিহা পাঠ করবে।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) প্রথম দিকে অনুচ্চ শব্দে কিরাআত পাঠ করা নামাযে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ করার পক্ষপাতি ছিলেন। বিশিষ্ট হানাফী আলেম আল্লামা মোল্লা আলী কারী, আবু হাসান সিন্ধী, আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী এবং রশীদ আহমদ গাংগুহী নিঃশব্দে কিরাআত পাঠ করা নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন (হক্কানী তফসীর-মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী)।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী বলেন, ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে আমি যতটুকু অনুসন্ধান করেছি তার আলোকে অধিকতর সঠিক পন্থা হচ্ছে এই যে, ইমাম যখন উচ্চস্বরে ফাতিহা পাঠ করবে, মুক্তাদীগণ তখন চুপ থাকবে। আর ইমাম যখন নিঃশব্দে ফাতিহা পাঠ করবে, তখন মুক্তাদীরাও চুপে চুপে ফাতিহা পাঠ করবে। এই পন্থায় কুরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশের বিরোধিতা করার কোন সন্দেহ থাকে না। ফাতিহা পাঠ সম্পর্কিত যাবতীয় দলীল সামনে রেখে এরূপ একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ করে না, অথবা সর্বাবস্থায় ফাতিহা পাঠ করে আমরা এটা বলতে পারি না যে, তার নামায হয় না। কেননা উভয় মতের স্বপক্ষে দলীল রয়েছে এবং এই ব্যক্তি জেনে বুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করছে না। বরং তার কাছে দলীলের ভিত্তিতে যে মতটি প্রমাণিত, সে সেই মতের ওপর আমল করছে। (রাসায়েল–মাসায়েল, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭৯, ১৮০)

কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা–ফাতিহা

١١ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ فَدَعَانِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ اُجِبْهُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ، قَالَ اَلَمْ يَقُوْلِ اللّٰهُ اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ: اَلاَ اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ نَّخْرُجَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّكَ قُلْتَ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ -

১১। আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে নববীতে নামায পড়ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে সশব্দে ডাকলেন। আমি (তখন নামাযে রত থাকার কারণে) তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। অতপর আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, হে

আল্লাহর রসূল! আমি নামাযে রত ছিলাম। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ কি বলেননি, "আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যখন তোমাদের ডাকেন তখন তাঁদের ডাকে সাড়া দাও?" (সূরা আনফালঃ ২৪) অতপর তিনি বললেনঃ তোমার মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে আমি কি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহান এবং সবচেয়ে বড় সূরাটি শিখিয়ে দেব না? একথা বলে তিনি আমার হাত ধরলেন। অতপর আমরা যখন মজিদ থেকে বের হতে উদ্যত হলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলেছেন, "আমি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি অবশ্যই শিখিয়ে দেব।" তিনি বললেনঃ তা আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা)। এটাই সাবউল মাসানী (পুনরাবৃত্ত সাত আয়াত) এবং তার সাথে রয়েছে মহান কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে। (বুখারী)

হযরত আবু সাঈদের (রা) নামাযরত অবস্থায় তাকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের ডাকার দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন তাকে ডাকছিলেন, তিনি তখন নফল নামায পড়ছিলেন। অতএব রসূলুল্লাহর (স) আহবান শুনার পর তার কর্তব্য ছিল নফল নামায ছেড়ে দিয়ে তাঁর কাছে হাযির হওয়া। কেননা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দেয়া ফরজ। আর তিনি তো তখন নফল নামায পড়ছিলেন। মানুষ যে কাজেই রত থাকুক–যখন তাকে আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে ডাকা হবে তখন এই ডাকে সাড়া দেয়া তার ওপর ফরজ।

السبع المثانى বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে–সেই সাতটি আয়াত যা নামাযে পুনপুন পাঠ করা হয়, অর্থাৎ সূরা ফাতিহা। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এই সাতটি আয়াত সবলিত সূরাটি কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা এবং এর সাথে রয়েছে কুরআন মজীদ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, এই আয়াত কয়টি পৃথক যা বারবার পাঠ করা হয় এবং তার সাথে কুরআন মজীদের অবস্থান। একথার তাৎপর্য হচ্ছে–একদিকে পুরা কুরআন শরীফ এবং অন্য দিকে সূরা ফাতিহা। এখান থেকেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, এটা কুরআন মজীদের সবচেয়ে বড় সূরা। কেননা সমগ্র কুরআনের মোকাবিলায় এই সূরাকে রাখা হয়েছে। এখানে চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে এই যে, ফাতিহাকে সবচেয়ে বড় সূরা বলার অর্থ এই নয় যে, তা শব্দ সংখ্যা ও আয়াত সংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বড় সূরা। বরং এর অর্থ হচ্ছে–বিষয়বস্তুর বিচারে সূরা ফাতিহা সবচেয়ে বড় সূরা। কেননা কুরআন মজীদের পুরা শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এই সূরার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

কুরআনের সাহায্যে বাড়িঘর সজীব রাখ

١٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরে পরিণত কর না। যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় তা থেকে শয়তান পলায়ন করে। (মুসলিম)।

এ হাদীসে দুটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এক, নিজেদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত কর না। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে–তোমাদের ঘরের অবস্থা যদি এই হয় যে, তাতে নামায পড়ার মত কোন লোক নেই এবং কুরআন পড়ার মত কোন লোকও নেই এবং কোররূপেই এটা প্রকাশ পায় না যে, তাতে কোন ঈমানদার লোক বা কুরআন পাঠকারী বসবাস করে–তাহলে এরূপ ঘর যেন একটি কবরস্থান। এটা মৃতজনপদ। এটা জীবন্তদের জনপদ নয়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে–যেহেতু সমস্ত পুরুষ লোক মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করে থাকে–এজন্য রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিজেদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না। অর্থাৎ পুরা নামায মসজিদেই পড় না; বরং এর কিছু অংশ ঘরে আদায় কর। যদি ঘরে নামায না পড়া হয় তাহলে এর অর্থ হচ্ছে–আপনারা মসজিদকে ঠিকই জীবন্ত রেখেছেন, কিন্তু ঘর কবরস্থানের মত হয়ে গেছে। এজন্য এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে মসজিদেও প্রাণ চঞ্চল থাকবে এবং ঘরও জীবন্ত থাকবে। এজন্য ফরজ নামায সমূহ মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করা এবং সুন্নাত, নফল ও অন্যান্য নামায ঘরে আদায় করা পছন্দনীয় বলা হয়েছে। এতে উভয় ঘরেই প্রাণ চাঞ্চল্য বিরাজ করবে।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় সেখান থেকে শয়তান পলায়ন করে। একদিকে রয়েছে সমগ্র কুরআন মজীদের মর্যাদা, অপরদিকে রয়েছে প্রতিটি সূরার স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বৈশিষ্ট। এখানে সূরা বাকারার মর্যাদা বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে–যে ঘরে এই সূরা পাঠ করা হয় সেখান থেকে শয়তান ভেগে পালায়। এটা কেন হয়ঃ এর কারণ হচ্ছে–সূরা বাকারার মধ্যে পারিবারিক জীবন এবং দাম্পত্য বিষয় সম্পর্কিত আইন–কানুন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিবাহ এবং তালাকের সাথে সম্পর্কিত আইনও এ সূরায় পূর্ণাংগভাবে

বর্ণিত হয়েছে। সমাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠ রাখার যাবতীয় মূলনীতি এবং আইন-কানুন এ সূরার আলোচনার আওতায় এসে গেছে। এ জন্য যেসব ঘরে বুঝে শুনে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় এবং তদনুযায়ী কাজ করা হয় সেসব ঘরে শয়তান প্রবেশ করে কখনো ঝগড়া-বিবাদ বাঁধাতে সফলকাম হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানব জীবনের সংশোধনের জন্য যে পথ নির্দেশ দিয়েছেন-তা যাদের জানা নেই অথবা জানা আছে কিন্তু তার বিরোধীতা করা হচ্ছে-শয়তান কেবল সেখানেই ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যে পরিবারের লোকেরা আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে অবগত এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত-শয়তান সেখানে কোনই পাত্তা পায় না এবং কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয় না।

কুরআন মজীদ কিয়ামতের দিন শাফা'আতকারী হবে

١٣. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَانَّهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ، اقْرَأُوْ الزَّهْرَا وَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ فَانَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَابَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا ، اقْرَأُوْ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَانْ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ-

১৩। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা কুরআন পড়। কেননা কুরআন তার পাঠকদের জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআতকারী হয়ে আসবে। দুটি চাকচিক্যময় ও আলোকিত সূরা-সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পাঠ কর। কেননা এই সূরা দুটি কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যেন-দুটি ছাতা অথবা ছায়া দানকারী দুই খন্ড মেঘ অথবা পাখির পালকযুক্ত দুটি প্রসারমান ডানা। তা নিজের পাঠকদের পক্ষ অবলম্বন করে যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে থাকবে। তোমরা সূরা বাকারা পাঠ কর। কেননা তা গ্রহণ করলে বরকত ও প্রাচুর্যের কারণ হবে। এবং তা পরিত্যাগ করলে আফসোস, হতাশা ও দুঃখের কারণ হবে। বিপথগামীরা এই সূরার বরকত লাভ করতে পারে না -(মুসলিম)।

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রথম যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে–"কুরআন মজীদ পাঠ করা। কেননা তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য শাফাআতকারী হয়ে আসবে।" একথার অর্থ এই নয় যে, তা মানুষের যাবতীয় বিপদ দূর করার জন্য অনমনীয় সুপারিশকারী হয়ে দাঁড়াবে বরং এর অর্থ হচ্ছে–যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে কুরআন পড়েছে এবং তদনুযায়ী নিজের জীবনকে সংশোধন করেছে–এই কুরআন কিয়ামতের দিন তার শাফাআতের উৎস হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার আদালতে এ কথা উত্থাপিত হবে যে, এই বান্দাহ তাঁর কিতাব পাঠ করেছে, তার অন্তরে ঈমান বর্তমান ছিল, সে যখনই এই কিতাবের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, তা পাঠ করতে নিজের সময় ব্যয় করেছে। এ জন্যই তা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে পাঠকের জন্য শাফাআতকারী হবে।

দ্বিতীয় যে কথাটি রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন তা হচ্ছে, কুরআন মজীদের দুটি অতি উজ্জ্বল সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান পাঠ কর। এ সূরা দুটিকে যার ভিত্তিতে আলোকময় সূরা বলা হয়েছে তা হচ্ছে–এই দুটি সূরার মধ্যে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী–খ্রীষ্টানদের সামনে পূর্ণাংগভাবে যুক্তিপ্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে এবং মুশরিকদের সামনেও। অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকেও এই সূরাদ্বয়ে তাদের ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক জীবনের পূর্ণাংগ হেদায়াত দান করা হয়েছে। তাদের যুদ্ধ এবং সন্ধী সম্পর্কিত, তাদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে এবং তাদের নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও হেদায়াত দান করা হয়েছে। মোট কথা এই দুটি সূরায় কুরআন মজীদের পুরা শিক্ষা ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জন্য বলা হয়েছে, এই সূরা দুটি পাঠ কর। কিয়ামতের দিন এই সূরা দুটি এমনভাবে উপস্থিত হবে যেমন কোন ছাতা অথবা মেঘ খন্ড অথবা পালক বিছানো পাখির পাখা। এই সূরাদ্বয় তার পাঠকারীর স্বপক্ষে দলীল পেশ করবে–তাদের সাহায্য করবে। কিয়ামতের দিন যখন কারো জন্য ছায়া বাকি থাকবে না তখন এই কঠিন মুহূর্তে কুরআন তার পাঠকারীদের জন্য ছায়া হয়ে উপস্থিত হবে। অনুরূপভাবে এই সূরাদ্বয় কিয়ামতের দিন তার পাঠককে বিপদ–মুসীবত থেকে উদ্ধারকারী এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে সাহায্যকারী হবে।

পুনরায় সূরা বাকারা সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হয়েছে–যে ব্যক্তি তা পাঠ করে তা তার জন্য বরকত ও প্রাচুর্যের কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি তা পাঠ করে না তার জন্য এটা আফসোসের কারণ হবে। সে কিয়ামতের দিন আফসোস করে বলবে, দুনিয়াতে সূরা বাকারার মত এত বড় নিয়ামত তার সামনে এসেছে কিন্তু সে তা থেকে কোন কল্যাণ লাভ করেনি। অতপর তিনি বলেছেন, বাতিলপন্থী লোকেরা এই সূরাকে সহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে সামান্যতম্য অন্যায় ও অসত্যের পূজা মওজুদ রয়েছে সে এই সূরাকে বরদাশত করতে পারে না। কেননা এই সূরাদ্বয়ের মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাতিলের মূলোৎপাটনকারী বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। যা কোন বাতিলপন্থী লোক বরদাশত করতে পারে না।

সূরা বাকারা ও আলে ইমরান ঈমানদার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেবে

١٤. عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : يُؤْتٰى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا- (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪। নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের দিন কুরআন মজীদ এবং তদনুযায়ী আমলকারী লোকদের উপস্থিত করা হবে। তাদের অগ্রভাগে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান থাকবে। এ দুটি যেন মেঘমালা অথবা মেঘের ছায়া–যার মধ্যে থাকবে বিদ্যুতের মত আলোক অথবা সেগুলো পালকে বিছানো পাখির পাখার ন্যায় হবে। এই দুটি সূরা তাদের পাঠকারীদের স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে থাকবে–(মুসলিম)।

পূর্ববর্তী হাদীসেও কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে একই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, উভয় সাহাবীই একই সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এ হাদীস শুনে থাকবেন। এবং উভয়ে নিজ নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আর এটাও হতে পারে যে, বিভিন্ন স্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই একই হাদীস বর্ণনা করে থাকবেন এবং দুই সাহাবীর বর্ণনা দুই ভিন্ন স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকবে। যাই হোক একথা সুস্পষ্ট যে হাদীস দুটির বিষয়বস্তু প্রায়ই এক।

পূর্ববর্তী বর্ণনায় শুধু কুরআন মজীদ পাঠকারীদের উল্লেখ ছিল, কিন্তু এ হাদীসে তদনুযায়ী আমলকারীদের কথাও উল্লেখ আছে। পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে, কুরআন মজীদ যদি সুপারিশকারী হয় তাহলে তা কেবল এমন লোকদের জন্যই হবে যারা কুরআন পাঠ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তদনুযায়ী কাজও করেছে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদ তো ঠিকই পড়ে কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করে না তাহলে কুরআন তার পক্ষে দলীল হতে পারে না।

এ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে–কুরআনের যেসব পাঠক তদনুযায়ী কাজ করে–কুরআন তাদের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে দাঁড়াবে এবং তাদের সাহায্য ও সুপারিশ করবে। কিয়ামতের দিন যখন ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন তাঁদেরকে কুরআনই সেখানে নিয়ে যাবে। যখন তাদেরকে আল্লাহর সমীপে পেশ করা হবে তখন কুরআনই যেন তাদের পক্ষে মুক্তির সনদ হবে। আমরা যেন দুনিয়াতে এই কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করে এসেছি– এই অর্থেই নবী (স)–এর এই হেদায়াতনামা। অন্য কথায় তাদের মুক্তির জন্য স্বয়ং এই কুরআনের সুপারিশই যথেষ্ট হবে। কেবল ঈমানদার সম্প্রদায়ের সাথেই এরূপ আচরণ করা হবে। এই দিন কাফের এবং মোনাফিকদের সাথে কুরআনের কোন সম্পর্ক থাকবে না। আর যেসব লোকেরা কুরআনের নির্দেশাবলী জানা সত্ত্বেও তার বিরোধিতা করেছে–কুরআন তাদেরও সহযোগী হবে না।

তিনি আরো বলেছেন, সূরা বাকারা ও আলে ইমরান ঈমানদার সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে। এর কারণ হচ্ছে–এ দুটি আইন–কানুন সংক্রান্ত সূরা। সূরা বাকারায় ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক জীবনের জন্য আইনগত হেদায়াত দান করা হয়েছে। আর সূরা আলে ইমরানে মোনাফিক ও কাফের সম্প্রদায় এবং আহলে কিতাব সবার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সূরায় ওহোদ যুদ্ধের ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এ ভাবে এই সূরা দুটি মুমিন জীবনের জন্য হেদায়াতের বাহন। কোন ব্যক্তি যদি এই সূরাদ্বয়ের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের পারিবারিক জীবনকে সংশোধন করে, নিজের অর্থনীতি এবং রাজনীতিকে তদনুযায়ী ঢেলে সাজায় এবং দুনিয়ায় ইসলামের সাথে যেসব ব্যাপারের সম্মুখীন হবে তাতেও যদি তারা এর হেদায়াত মোতাবেক ঠিক ঠিক কাজ করে তাহলে এরপর তাঁর ক্ষমা ও পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি থাকতে পারে না। অতএব এ সূরা দুটি হাশরের মাঠে ঈমানদার সম্প্রদায়ের হেফাজত করবে। হাশরের ময়দানে যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করবে–এই সূরাদ্বয় তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে এবং আল্লাহর আদালতে হাযির হয়ে তাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবে।

কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত–আয়াতুল কুরসী

١٥. عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَااَبَاالْمُنْذِرِ! اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعْظَمُ، قُلْتُ: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ يَااَبَا الْمُنْذِرِ: اَتَدْرِىْ اَىُّ

آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعْظَمُ ، قُلْتُ : اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ، اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ : لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ – (رَوَاهُ مُسْلِم)

১৫। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হে আবুল মুনযির! আল্লাহ তাআলার কিতাবে তোমার জানা কোন্ আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি পুনরায় বললেনঃ হে আবুল মুনযির! আল্লাহ তাআলার কিতাবে তোমার জানা কোন আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ? আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম" আয়াত। রাবী বলেন, তিনি আমার বুকে মৃদু আঘাত করে বললেনঃ এই জ্ঞান তোমার জন্য মুবারক হোক প্রাচুর্যময় হোক। (মুসলিম)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সেই সব সাহাবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা কুরআন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অদিকারী ছিলেন; কুরআন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং সহাবায়ে কিরামদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

এ হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রশিক্ষন পদ্ধতির একটি দিক। সাহাবায়ে কেরাম দীনের কতটা জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং কুরআনকে কতটা বুঝেছেন তা জানার জন্য তিনি মাঝে মাঝে তাদেরকে বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন করতেন। সাহাবাদের নীতি ছিল,তারা রসূলুল্লাহর (স) প্রশ্নের জবাব নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী দেয়ার পরিবর্তে আরো অধিক জানার লোভে আরজ করতেন,আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক ভাল জানেন। তাদের লক্ষ্য ছিল,তিনি নিজে তা বলে দিবেন এবং এতে তাদের জ্ঞানের পরিধি আরো বেড়ে যাবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য যদি সাহাবাদের আরো অধিক শেখানো হত তাহলে সাহাবাদের বক্তব্য "আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন" প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়ে দিতেন। আর যদি তার উদ্দেশ্য হত সাহাবাগণ আল্লাহর দীন সম্পর্কে কি পরিমান জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তা জানা –তাহলে তিনি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বরং তার পুনরাবৃত্তি করতেন এবং তাদের কাছ থেকে উত্তর আশা করতেন। এখানে এই দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য ছিল। নবী (স) উবাই ইবনে কা'বকে(রা) প্রথমদফা প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন,আল্লাহ এবং তাঁর রসূল অধিক ভাল জানেন। যেহেতু রসূলুল্লাহর (স) লক্ষ্য ছিল উবাই ইবনে কা'বের জানামতে কুরআন মজীদের কোন আয়াতটি সর্বাধিক ভারী–তা অবগত হওয়া,তাই তিনি পূনরায় একই প্রশ্ন করলেন।

এর উত্তরে তিনি বললেন আয়াতুল কুরসী হচ্ছে সবচেয়ে বড় আয়াত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার জবাবের সমর্থন করলেন।

আয়াতুল কুরসীর এই মহত্ব এবং গুরুত্ব এই জন্য যে,কুরআন মজীদের যে কয়টি আয়াতে একত্ববাদের পূর্ণাঙ্গ বর্ননা দেয়া হয়েছে–আয়াতুল কুরসী তার অন্যতম। আল্লাহ তাআলার সত্বা এবং গুণাবলীর সর্বাংগীণ বর্ণনা এক তো সূরা হাশরের শেষ আয়াতে রয়েছে,দ্বিতীয়ত সূরা ফোরকানের প্রাথমিক আয়াত এবং তৃতীয়ত সূরা ইখলাস ও আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে। হযরত উবাই ইবনে কা'বা (রা) যখন এই জবাব দিলেন তখন রসূলুল্লাহ (স) তার বুকে মৃদু আঘাত করে বললেন, এই জ্ঞান তোমার জন্য কল্যাণকর হোক। বাস্তবিকই তুমি সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছো যে,এই আয়াতই কুরআন মজীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহত আয়াত। আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে সঠিক ধারনা দেয়ার জন্যই কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে। মানুষ যদি আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারনা লাভ করতে না পারে তাহলে তার বাকি সমস্ত শিক্ষাই সম্পূর্ণ বেকার এবং অর্থহীন হয়ে যায়। মানুষের মাঝে তৌহীদের বুঝ এসে গেলে দ্বীনের ভিত্তি কায়েম হয়ে গেল। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে আয়াতের মধ্যে তৌহীদের বিষয়বস্তুকে সর্বোত্তম পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে তাই কুরআন মজীদের সর্ববৃহৎ আয়াত।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলাত সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা

١٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكٰوةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْمِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهٗ وَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَّعَلَىَّ عِيَالٌ وَّلِىْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ ، قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَبَاهُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَكٰى حَاجَةً شَدِيْدَةً وَّعِيَالاً فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ ، قَالَ اَمَا اِنَّهٗ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ، فَعَرَفْتُ اَنَّهٗ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهٗ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهٗ

فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لاَ رْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِىْ فَاِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ
لاَ اَعُوْدُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ ، فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ ، قُلْتُ
يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَكٰى حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ
سَبِيْلَهُ، فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُّهُ فَجَاءَ يَحْثُوْ
مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ لاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا اٰخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتِ اِنَّكَ تَزْعَمُ لاَ تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ،
قَالَ دَعْنِىْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَّنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ
فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ حَتّٰى تَخْتِمَ
الْاٰيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ يَّزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرُبُكَ الشَّيْطَانُ
حَتّٰى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَافَعَلَ اَسِيْرُكَ قُلْتُ زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِىْ
كَلِمَاتٍ يَّنْفَعُنِىَ اللّٰهُ بِهَا ، قَالَ اَمَا اِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ وَتَعْلَمُ
مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ، قُلْتُ لاَ، قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ –

১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে রমযানের ফিতরার সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। একরাতে এক আগন্তুক আমার কাছে আসল এবং (স্তূপিকৃত) শস্য ইত্যাদি হাতের আজল ভরে উঠাতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম,আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করব। সে বলতে লাগল,আমি খুবই অভাবগ্রস্ত মানুষ,আমার অনেক সন্তান রয়েছে এবং আমার নিদারুন অভাব রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা)

বলেন, আমি (দয়া পরবশ হয়ে) তাকে ছেড়ে দিয়েছি। যখন সকাল হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে আবু হুরায়রা, তুমি গত রাতে যাকে গ্রেপ্তার করেছিলে তার খবর কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে নিজের নিদারুন অভাবের কথা বর্ণনা করল এবং বলল, তার অনেক সন্তান-সন্তুতি রয়েছে। এ জন্য আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেনঃ "সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে পূণরায় আসবে"। আমি নিশ্চিত হলাম যে, সে পূণরায় আসবে। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, সে পূণরায় আসবে। অতএব আমি তার আসার প্রতিক্ষায় ওৎ পেতে থাকলাম। পরবর্তী রাতে সে ফিরে এসে খাদ্যশস্য চুরি করতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির করবো। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা আমি গরীব মানুষ এবং আমার বালবাচ্চা রয়েছে। আমি আর কখনও আসবো না। আমি পূণরায় দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। দ্বিতীয় দিন ভোরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! তোমার খবর কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে তার কঠিন অভাবের কথা বর্ণনা করল এবং বলল, তার অনেক বাল-বাচ্চা রয়েছে। আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নবী (স) বললেন, সে তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে এবং সে পূণরায় আসবে। আমি তার আসার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলাম। অতএব সে পূণরায় এসে খাদ্যশস্য চুরি করল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করব। এটা তিন বারের শেষবার এবং প্রতিবারই তুমি বলেছ, আমি আর আসব না অথচ তুমি আসছ। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কয়টি বাক্য শিখিয়ে দেব যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আপনাকে অশেষ কল্যাণ দান করবেন। রাতের বেলা আপনি যখন নিজের বিছানায় ঘুমাতে যাবেন তখন এই আয়াতুল কুরসী "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইউম"-শেষ পর্যন্ত পাঠ করবেন। আপনি যদি এরূপ করেন তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা আপনার জন্য একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত কোন শয়তান আপনার কাছে ভিড়তে পারবে না। (রাবি বলেন), সে যখন আমাকে এটা শিখালো আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর বেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেনঃ তোমার বন্দিকে কি করলে? আমি বললাম, সে আমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিয়েছে। তার দাবী হচ্ছে, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। নবী (স) বললেনঃ

"সে তোমাকে সত্য কথাই বলেছে, কিন্তু সে নিজে হচ্ছে ডাহা মিথ্যুক। তুমি কি জান তুমি তিন রাত যাবত কার সাথে কথা বলেছ? আমি বললাম, না আমি জানি. না। তিনি বললেন সে ছিল একটা শয়তান।" –(বুখারী)

এখানে রমযানের যাকাত বলতে ফিৎরার মাল বুঝানো হয়েছে। দিনের বেলা তা থেকে বিতরণ করার পর যা অবশিষ্ট থাকত রাতের বেলা তার হেফাজতের প্রয়োজন দেখা দিত। একবার হযরত আবু হুরায়রা (রা) যখন এই মালের রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন তখন এই ঘটনা ঘটেছিল যার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে।

এটা এমন সব ঘটনার অন্তর্ভূক্ত যে সম্পর্কে মানুষ কোন ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয় যে,এটা কিভাবে ঘটল। যাই হোক এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার মানুষের সামনে ঘটেছে।

কুরআন মজিদের ফযীলাত সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ হাদীস সন্নিবেশ করার কারণ এই যে,শয়তান নিজেও একথা স্বীকার করে যে, যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াতুল কুরসী পাঠ করে শয়ন করে তার উপর শয়তানের কোন আধিপত্য চলে না।

এ কথা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে,কুরআন মজীদের এমন কয়েকটি স্থান রয়েছে যেখানে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তৌহীদের পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তির মন মগজে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের চিত্র অংকিত হয়ে গেছে তার উপর শয়তানের আধিপত্য কি করে চলতে পারে ? এই শয়তান তো তার ধারে কাছে আসতে পারে না।

এই আয়াতুল কুরসীকে যদি কোন ব্যক্তি বুঝে পড়ে এবং এর অর্থ সে যদি হৃদয়াংগম করতে পারে তা হলে শয়তান তার ধারে কাছে আসারও দুসাহস করেনা। আয়াতুল কুরসী স্বয়ং বরকত ও কল্যাণে পরিপূর্ণ। শুধু এর তিলাওয়াতও বরকতের কারণ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু পাঠক যদি তার অর্থ বুঝে পড়ে তাহলে তার ওপর শয়তানের কোন প্রভাবই খাটেনা।

দুটি.নুর –যা কেবল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দান করা হয়েছে

١٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْضًا مِّنْ فَوْقِهٖ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلَّا

الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ قَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمْ تَقْرَأْ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا اِلاَّ اُوْتِيْتَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ـ

১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। এসময় তিনি আকাশের দিক থেকে দরজা খোলার শব্দের অনুরূপ শব্দ শুনতে পেলেন। হযরত জিবরীল (আ) নিজের মাথা উপরের দিকে উত্তোলন করে দেখলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে বললেন, এটা আসমানের একটি দরজা যা আজই প্রথম খোলা হয়েছে। এ দরজা ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। ইত্যবসরে এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেস্তা নাযিল হল। জিবরীল (আ) বললেন, এ হচ্ছে এক ফেরেস্তা—আসমান থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে, ইতিপূর্বে এই ফেরেস্তা আর কখনো পৃথিবীতে নাযিল হয়নি। এই ফেরেস্তা এসে তাঁকে সালাম করে বলল, দুটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা কেবল আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। তা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। এ দুটির একটি শব্দ পাঠ করলেও আপনাকে সেই নূর দান করা হবে।—(মুসলিম)

এ হাদীস পড়তে গিয়ে মানুষের মনে প্রথম যে প্রশ্নের উদয় হয় তা হচ্ছে—আসমানের দরজা খুলে যাওয়া এবং তা থেকে দরজা খোলার শব্দ আসার তাৎপর্য কি? এ প্রসংগে সর্বপ্রথম একথা বুঝে নিতে হবে যে, আসমানের কোন দরজা খোলার শব্দ জিবরীল আলাইহিস সালাম অথবা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুনেছিলেন, আমি বা আপনি নই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—আসমানী জগতের ঘটনাগুলো এমন পর্যায়ের যে, তা যথাযথভাবে তুলে ধরার মত শব্দ মানবীয় ভাষায় নেই বা হতেও পারেনা। এজন্য এসব ব্যাপার বুঝানোর জন্য বা মানুষের বোধ গম্যের কাছাকাছি আনার জন্য রূপক ভাষা অথবা উপমার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুনিয়াতে যেভাবে দরজা সমূহ খোলা হয় এবং এর যা অবস্থা হয় অনুরূপভাবে উর্ধ জগতেরও অসংখ্য দরজা রয়েছে এবং সেগুলো যখন খোলা হয় তখন তার মধ্য দিয়ে কোন কিছু যাতায়াত করে থাকে। এমন নয় যে, দরজা সব সময় খোলা থাকে এবং যখন তখন যে কেউ আসা যাওয়া করতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, আসমানের কোন দরজা খোলা এবং তার মধ্যে দিয়ে উপর থেকে

কোন ফেরেশতার নীচে আসার ঘটনা ঘটেছিল, যাতে দরজা খোলার শব্দের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে। এই অবস্থাটা অবশ্যই অনুভূত হয়–কিন্তু তা কেবল আল্লাহর ফেরেশতা অথবা তাঁর রসূলই অনুভব করতে পারেন। আমরা তা অনুভব করতে পারিনা। কেননা এগুলো মানুষের অনুভূতিতে ধরা পড়ার মত জিনিস নয়।

এ হাদীসে দ্বিতীয় যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে–রসূলুল্লাহকে যে ফেরেশতা সুসংবাদ দেয়ার জন্য এসেছিলেন তিনি ইতিপূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আসেননি। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাকে এই বিশেষ পয়গাম পৌঁছানোর জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। অন্যথায় তিনি পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা ছিল এই যে, আপনার কল্যাণ হোক। আপনাকে এমন দুটি তুলনাহীন জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্বে কোন নবীকেই দেয়া হয়নি। তার একটি হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং অপরটি হচ্ছে সূরা বাকারার শেষ অংশ।

ঘটনা হচ্ছে এই যে, সূরা ফাতেহার সামান্য কটি আয়াতের মাধ্যমে এত বিরাট বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরা কুরআন শরীফের সংক্ষিপ্তসার এতে এসে গেছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বক্তব্য হচ্ছে–আমাকে বাক্য ও কথা দান করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিরাট বিরাট বিষয়বস্তু কয়েকটি ছত্রেই আদায় হয়ে গেছে। বাইবেলের সাথে কুরআনের তুলনা করে দেখলে জানা যায় যে, কখনো কখনো যে কথা বর্ণনা করতে বাইবেলের কয়েকটি পৃষ্ঠা খরচ করা হয়েছে তা কুরআনের একটি মাত্র ছত্রেই বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে সূরা ফাতেহা এই সংক্ষিপ্ততা ও পূর্ণাংগতার দিক থেকে অগ্রগণ্য। তথাপি সূরা ফাতিহার এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অর্থ এ নয় যে, এই সূরার মধ্যে যে বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে তা ইতিপূর্বে কোন নবীর কাছে আসেনি। কথা এটা নয়, কারণ সব নবীই সেই শিক্ষা নিয়ে আগমণ করেছেন যা এই সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে, পার্থক্য কেবল এই যে, এই সূরায় মাত্র কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থবোধক একটি সমুদ্রের সংকুলান করা হয়েছে এবং দ্বীনের সার্বিক শিক্ষার সারসংক্ষেপ এতে এসে গেছে। এরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট মণ্ডিত কোন জিনিস পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি।

দ্বিতীয় নূর যার সুসংবাদ এই ফেরেশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শুনিয়েছেন তা হচ্ছে সূরা বাকারার শেষ অংশ। অর্থাৎ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ থেকে নি وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ পর্যন্ত। এই আয়াতগুলিতে তৌহীদের পুরা বর্ণনা এবং নবী আলাইহিস সালামের যাবতীয় শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ইসলামী আকীদা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঈমানদার সম্প্রদায়কে বলে দেয়া

হয়েছে, হক ও বাতিলের সংঘর্ষে যদি সমগ্র কুফরী শক্তিও তাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহলে কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করেই তাদের মোকাবিলা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছেই সাহায্য এবং বিজয়ের জন্য দোয়া করতে হবে। এই শেষ অংশে উল্লেখিত অসাধারণ বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে তাকে এমন নূর বলা হয় হয়েছে যা পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি।

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলাত

١٨. عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَءَ بِهِمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।–(বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ, এই দুটি আয়াত মানুষকে যে কোন ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট। কোনব্যক্তি যদি এ আয়াতগুলো ভালভাবে হৃদয়াংগম করে পড়ে তাহলে সে এর গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াতের ফজিলাত

١٩. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيٰتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ – (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের (বিপর্যয়) থেকে নিরাপদ থাকবে।–(মুসলিম)

সূরা কাহ্‌ফের প্রারম্ভিক দশ আয়াতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যে সময়ে তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের অধীনে খৃষ্টানদের ওপর কঠোর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল এবং তাদেরকে একথা স্বীকার করতে বাধ্য করা হচ্ছিল যে, তারা এক আল্লাহকে পরিত্যাগ করে রোমীয়দের মা'বুদ এবং দেবতাদের প্রভু হিসাবে

মেনে নিবে এবং এদের সামনে মাথা নত করবে। এই কঠিন সময়ে কয়েকজন নওজোয়ান হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনে এবং তারা এই অমানুষিক অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ী সব কিছু ফেলে রেখে পালিয়ে আসে। তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়, 'আমরা কোন অবস্থায়ই আমাদের মহান প্রতিপালককে পরিত্যাগ করবো না এবং শিরকের পথও অবলম্বন করবো না-এতে যাই হোক না কেন।' সুতরাং তারা কারো আশ্রয় না চেয়ে কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করে পাহাড়ে গিয়ে এক গুহায় বসে যায়।

বলা হয়েছে যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের এই প্রাথমিক আয়াতগুলো মুখস্ত করে নিবে এবং তা নিজের মন-মগজে বসিয়ে নেবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। প্রকাশ থাকে যে, দাজ্জালের ফিতনাও এই ধরনেরই হবে-যেমন ঐ সময়ে এই যুবকগণ যার সম্মুখীন হয়েছিল। এজন্য যে ব্যক্তির সামনে আসহাবে কাহ্ফের দৃষ্টান্ত মওজুদ থাকবে সে দাজ্জালের সামনে মাথানত করবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি এই দৃষ্টান্ত ভুলে গেছে সে দাজ্জালের ফিতনার শিকার হয়ে পড়তে পারে। এরই ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলো নিজের স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করবে সে দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে বেঁচে যাবে।

সূরা মুমিনূনের ফযীলাত

২০. عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ اِذَا نَزَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْىُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهٖ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَلَبِثْنَا سَاعَةً فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِ عَنَّا وَاَرْضِنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ اُنْزِلَ عَلَىَّ عَشْرُ اٰيَاتٍ مَنْ اَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَاَ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى خَتَمَ الْعَشْرَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَاَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ - وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ *

২০। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যখন অহী নাযিল হত তখন তাঁর মুখের কাছ থেকে মৌমাছির গুনগুন শব্দের মত আওয়াজ শুনা যেত। আমি কিছুক্ষণ বসে থাকলাম তিনি কিবলার দিকে ফিরলেন এবং দুই হাত তুলে বললেন, "হে আল্লাহ! আমাদের আরো দাও এবং কমিয়ে দিওনা, আমাদের মনে-সম্মান দান কর এবং অপদস্থ করোনা, আমাদের (তোমার নিয়ামত) দান কর এবং বঞ্চিত করনা, আমাদের অন্যদের অগ্রবর্তী কর, অন্যদেরকে আমাদের অগ্রবর্তী করনা, আমাদের ওপর তুমি রাজী হয়ে যাও এবং আমাদের সন্তুষ্ট কর।" অতপর তিনি বললেনঃ "এই মাত্র আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে যার মানদন্ডে কেউ উত্তীর্ণ হলে সে নিসন্দেহে জান্নাতে যাবে।" অতপর তিনি পাঠ করলেন,"নিশ্চিতই ঈমানদার লোকেরা কল্যাণ লাভ করেছে।....অতপর তিনি দশটি আয়াত পাঠ সমাপ্ত করলেন।" (তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ, হাকেম)

٢١. عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَابْنُوْسَ قَالَ قُلْنَا لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْاٰنُ فَقَرَأَتْ "قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ" . . . . حَتّٰى انْتَهَتْ اِلٰى "وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ" قَالَتْ هٰكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * رَوَاهُ النَّسَائِيُّ *

২১। ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, কুরআনই হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র। অতপর তিনি পাঠ করলেন, "নিশ্চিতই ঈমানদার লোকেরা কল্যাণ লাভ করেছে.... তিনি-"এবং যারা নিজেদের নামায সমূহের পূর্ণ হেফাজত করে," পর্যন্ত পাঠ করলেন। অতপর তিনি বললেন, "এরূপই ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র।"-(নাসায়ী)

٢٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
خَلَقَ اللّٰهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهٖ لَبِنَةً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَلَبِنَةً مِنْ
يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ وَلَبِنَةً مِنْ زَبَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ مَلَاطُهَا الْمِسْكُ
وَحُصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَحَشِيْشُهَا الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ قَالَ لَهَا اَنْطِقِىْ-
قَالَتْ " قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ " فَقَالَ اللّٰهُ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ
لَا يُجَاوِرُنِىْ فِيْكِ بَخِيْلٌ ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ " اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِى
الدُّنْيَا وَرَوَاهُ الْحَافِظُ الْبَزَّارُ وَالطَّبْرَانِىُّ بِنَحْوِهٖ *

২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে 'আদন' নামক জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। এর একটি থাম সাদা মুক্তা পাথরের, একটি থাম লাল চুণি পাথরের এবং একটি থাম সবুজ পুস্পরাগ মণির তৈরী। এর মেঝে কস্তুরীর, এর নুড়িপাথর গুলো মোতির তৈরী এবং এর লতাকুঞ্জ কুমকুমের তৈরী। অতপর তিনি তাকে বললেন, কথা বল। সে বলল, নিশ্চিতই ঈমানদার লোকেরা কল্যাণ লাভ করেছে। তখন আল্লাহ বললেন, আমার ইজ্জত, শানশওকত ও মহত্ত্বের শপথ! কোন কৃপণ তোমার মধ্যে প্রবেশ করার জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করতে পারবেনা। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেনঃ "বস্তুত যেসব লোককে তাদের দিলের সংকীর্ণতা (বা লোভপূর্ণ কার্পন্য) থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই কল্যাণ লাভ করবে।" –(সূরা হাশর। ৯)। –(ইবনে আবিদ–দুনিয়া, বাযযার, তাবারানী)

হাদীসের যে দশটি আয়াতের কথা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ * الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ *
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ * وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ *
وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ * اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ

اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ * فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْعٰدُوْنَ * وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ * وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ * اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ * الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

"মুমিন লোকেরা নিশ্চিতই কল্যাণ লাভ করেছে, যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়। যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। নিজেদের স্ত্রীদের ছাড়া এবং সেই মেয়েদের ছাড়া–যারা তাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন হবে। এই ক্ষেত্রে (হেফাজত না করা হলে) তারা ভর্ৎসনাযোগ্য নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি এদের ছাড়া অন্য কিছু চাইবে তারা সীমা লংঘনকারী হবে। যারা নিজেদের আমানত এবং নিজেদের ওয়াদা–চুক্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে। যারা নিজেদের নামাযের হেফাজত করে। এরাই হচ্ছে উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে।"

এখানে মুমিন বলতে সেই লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কবুল করে নিয়েছে, তাঁকে নিজেদের পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তাঁর উপস্থাপিত জীবন–বিধানকে অনুসরণ করে চলতে প্রস্তুত হয়েছে।

এই সূরার প্রথম ৯টি আয়াতে ঈমানদার লোকদের ৭টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন মুমিন ব্যক্তি এই সাতটি গুণ অর্জন করতে পারলে সে নিশ্চিতই বেহেশতে যাবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দশম ও একাদশ আয়াতে এদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বেহেশত জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছেন। অতএব আয়াতে উল্লেখিত গুণ বৈশিষ্ট গুলো অর্জন করার একান্ত চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

প্রথম গুণ হচ্ছে, বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা। 'খুশু' শব্দের অর্থ, কারো সামনে বিনীতভাবে অবনত হওয়া, বিনীত হওয়া, নিজের কাতরতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা, স্থির থাকা। অন্তরের 'খুশু' হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি আল্লাহর প্রতাপ ও মহত্ত্বের কথা চিন্তা করে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। আর দেহের 'খুশু' হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন মাথা নত রাখবে, অংগ–প্রত্যংগ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে, দৃষ্টি অবনমিত হবে, কণ্ঠস্বর নম্র ও বিনয়পূর্ণ হবে। এই খুশুই হচ্ছে নামাযের আসল প্রাণশক্তি ও ভাবধারা। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আর মুখের দাড়ি নিয়ে খেলা করছে। তখন তিনি বললেন,

لَوْخَشَعَ قَلْبُهٗ خَشَعَتْ جَوَارِحُهٗ

"এই ব্যক্তির অন্তরে যদি 'খুশু' থাকত তাহলে তার অংগ-প্রতংগের ওপর খুশু পরিলক্ষিত হত।"-(তফসীরে মাযহারী, তাফহীমুল কুরআন)।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছেঃ অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা। মূল শব্দ হচ্ছে 'লাগবুন'-। এমন প্রতিটি কথা ও কাজকে 'লাগবুন' বলা হয় যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এবং নিষ্ফল। যেসব কথা বা কাজের কোনই ফল নাই, উপকার নাই, যা থেকে কোন কল্যাণকর ফলও লাভ করা যায় না, যার প্রকৃতই কোন প্রয়োজন নেই এবং যা থেকে কোন ভাল উদ্দেশ্য লাভ করা যায়না- এ সবই অর্থহীন, বেহুদা ও বাজে জিনিস এবং لغو বলতে এসবই বুঝায়। ঈমানদার লোকদেরকে এসব জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

"মুমিন লোকেরা যদি এমন কোন জাগায় গিয়ে পড়ে যেখানে অর্থহীন ও বাজে কাজ বা কথা হচ্ছে -তাহলে সেখান থেকে আত্মমর্যাদা সহকারে কেটে পড়ে।"-(সূরাফোরকানঃ৭২)

মুমিন ব্যক্তি সুস্থ স্বভাবের অধিকারী হয়ে থাকে। সে পবিত্র চরিত্র ও উন্নত রুচির ধারক। সে অর্থপূর্ণ কথাবার্তাই বলবে, কিন্তু অর্থহীন গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করতে পারেনা। সে হাস্যরস ও রসিকতা করতে পারে, কিন্তু তাৎপর্যহীন হাসিঠাট্টা নয়। সে অশ্লীল গালিগালাজ, লজ্জাহীন কথাবার্তা বলতেও পারে না, সহ্যও করতে পারেনা। আল্লাহ তাআলা বেহেশতের একটি বৈশিষ্ট এই উল্লেখ করেছেন যে, "সেখানে তারা কোন অর্থহীন ও বেহুদা কথাবার্তা শুনবেনা।"-(সূরা গাশিয়াঃ১১)

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

مِنْ حُسْنِ الْاِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَالَا يَعْنِيْهِ -

"মানুষ যখন অর্থহীন বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে।"- (তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ)।

তৃতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছেঃ যাকাত দেয়া এবং যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হওয়া। যাকাত অর্থ একদিকে যেমন আত্মার পবিত্রতা অর্জন, অন্যদিকে এর অর্থ ধন-সম্পদের পবিত্রতাবিধান।

চতুর্থ বৈশিষ্ট হচ্ছেঃ লজ্জাস্থানের হেফাজত করা। এর দুটি অর্থ রয়েছে। এক, নিজেদের দেহের লজ্জাস্থান সমূহকে ঢেকে রাখা, নগ্নতাকে প্রশ্রয় না দেয়া এবং অপর লোকদের সামনে নিজের লজ্জাস্থানকে প্রকাশ না করা।

দুই, তারা নিজেদের পবিত্রতা ও সতীত্বকে রক্ষা করে। অর্থাৎ অবাধ যৌনাচার করে বেড়ায়না। পাশবিক প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করেনা।

পঞ্চম বৈশিষ্ট হচ্ছে-আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ ও তা প্রত্যর্পণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ -

"যার আমানতদারীর গুণ নাই তার ঈমান নাই"-(বায়হাকীর শুআবুল ঈমান)।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট হচ্ছে-ওয়াদা-চুক্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"যে ওয়াদা-চুক্তি রক্ষা করেনা তার কোন ধর্ম নেই।"-(বায়হাকীর শুআবুল ঈমান)

বস্তুত আমানতের খেয়ানত এবং ওয়াদা-চুক্তি ভংগ করাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোনাফিকের চারটি লক্ষনের অন্যতম দুটি লক্ষণীয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ -

"সে যখন ওয়াদা করে ভংগ করে এবং তার কাছে যদি কিছু আমানত রাখা হয় তার খেয়ানত করে।"-(বুখারী, মুসলিম)।

সপ্তম বৈশিষ্ট হচ্ছে-নামাযের হেফাজত করা। নামাযের হেফাজতের অর্থ হচ্ছে নামাযের নির্দিষ্ট সময় সমূহ, এর নিয়ম-কানুন, শর্ত ও রোকন সমূহ, নামাযের বিভিন্ন অংশ-এক কথায় নামাযের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের পূর্ণ সংরক্ষণ করা।

যে ব্যক্তি এসব গুণ বৈশিষ্টের অধিকারী হয়ে যায় এবং এর ওপর স্থির থাকে, সে পূর্ণাংগ মুমিন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্যের অধিকারী।

সূরা ইয়াসীনের ফযীলাত

২৩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ . وَمَنْ قَرَاَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ -

২৩। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিটি জিনিসেরই একটি হৃদয় আছে এবং কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তা পাঠের বিনিময়ে তাকে দশবার পূর্ণ কুরআন পাঠ করার সওয়াব দান করেন।–ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে গরীব হাদীস বলেছেন।

২٤. وَرَوَى الْحَافِظُ اَبُوْ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ قَرَاَ يٰسٓ فِيْ لَيْلَةٍ اَصْبَحَ مَغْفُوْرًا لَهٗ - وَمَنْ قَرَاَ حٰمٓ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا الدُّخَانُ اَصْبَحَ مَغْفُوْرًا لَهٗ - اَخْرَجَهُ الْحَافِظُ الْمَوْصِلِيُّ

২৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা ইয়াসীন পাঠ করে–সে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় সকালে ঘুম থেকে উঠে। আর যে ব্যক্তি সূরা হা–মী–ম পাঠ করে, যার মধ্যে ধোঁয়ার কথা উল্লেখ আছে (অর্থাৎ সূরা দোখান)–সে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় সকালে ঘুম থেকে উঠে।–হাফেজ মুসেলী তাঁর গ্রন্থে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

২৫. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاَ يٰسٓ فِيْ لَيْلَةٍ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ غُفِرَ لَهٗ * رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهٖ *

২৫। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাতের বেলা সূরা ইয়াসীন পাঠ করে—তার গুণাহ মাফ করে দেয়া হবে।

٢٦. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِقْرَأُوْهَا عَلٰى مَوْتَاكُمْ " يَعْنِىْ يٰسٓ * رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَاَحْمَدُ *

২৬। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "এটা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের নিকট পাঠ কর।" অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন। (আবূদ দাউদ, নাসাই,, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমদ)

٢٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوَدِدْتُ اَنَّهَا فِىْ قَلْبِ كُلِّ اِنْسَانٍ مِّنْ اُمَّتِىْ - رَوَاهُ الْبَزَّارُ *

২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি আশা করি আমার উম্মাতের প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়ে এই সূরাটি (ইয়াসীন) গাঁথা থাক। (বুখারী)

হাফেজ ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর দামেশকী (মৃতঃ ৭৭৪ হিঃ) বলেন, এসব হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, কোন কঠিন বিপদ বা শক্ত কাজ সামনে উপস্থিত হলে—তখন এই সূরা পাঠ করার বরকতে আল্লাহ তাআলা সেই বিপদ বা কাজ সহজ করে দেন। মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট এই সূরা পাঠ করতে বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, এসময় আল্লাহ তাআলা রহমত ও বরকত নাযিল করেন এবং সহজভাবে রূহ বের করে নেয়া হয়। আসল ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন। ইমাম আহমাদ (রহ) বলেছেন, আমাদের প্রবীণরা বলতেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে আল্লাহ তার কষ্ট লাঘব করে দেন। (তফসীরে ইবনে কাসীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৪)

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) ইকরামা, দাহহাক, হাসান বসরী ও সুফিয়ান ইবনে উআইনা বলেন, 'ইয়াসীন' অর্থ 'হে মানুষ' বা 'হে ব্যক্তি।' কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, ইয়া সাইয়েদ (হে নেতা)

কথাটির শব্দসংক্ষেপ হচ্ছে ইয়াসীন।' এই সব কটি অর্থের দিক দিয়েই বলা যায়, এখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

'সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃদয়'–এই উপমাটি ঠিক তেমনি যেমন বলা হয়েছে 'সূরা ফাতিহা কুরআনের মা'। সূরা ফাতিহাকে কুরআনের মা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে কুরআন মজীদের সমগ্র শিক্ষার সারকথা বিবৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা ইয়াসীন কুরআনের জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দিল এই হিসাবে যে, এই সূরা কুরআনের দাওয়াতকে অতীব জোরালোভাবে পেশ করে। এর প্রচন্ডতায় স্থবিরতা চূর্ণ হয় এবং প্রাণে অগ্নিশীলতা সৃষ্টি হয়।

মুমূর্ষু ব্যক্তির সামনে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এর ফলে মুসলমানের মনে মৃত্যুকালে সমস্ত ইসলামী আকীদা তাজা ও নতুন হয়ে যায় এবং তার সামনে আখেরাতের পুরা নকশা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর তাকে পরবর্তী কোন সব মঞ্জিলের সন্মুখীন হতে হবে–তা সে স্পষ্ট জানতে পারে। এই কল্যাণ দৃষ্টির পূর্ণতা বিধানের জন্য–আরবী বোঝেনা এমন লোকদের সামনে এই সূরা পাঠ করার সাথে সাথে তার অর্থও পড়ে শুনান আবশ্যক। এর সাহায্যেই নসীহত স্মরণ করিয়ে দেয়ার কাজটিও পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে। –(সূরা ইয়াসীনের ভূমিকা, তাফহীমুল কুরআন, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ২৪৪)

সূরা মুলকের ফযীলাত

২৮. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خِبَاءَهٗ عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لاَيَحْسِبُ اَنَّهٗ قَبْرٌ فَاِذَا قَبْرُ الْاِنْسَانِ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا * فَاَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ضَرَبْتُ خِبَائِيْ عَلٰى قَبْرٍ وَاَنَا لاَ اَحْسِبُ اَنَّهٗ قَبْرٌ فَاِذَا فِيْهِ اِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا * فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ –

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন এক সাহাবী কবরের ওপর তাবু টানান। তিনি অনুমান করতে পারেননি যে, এটা একটা কবর। এটা ছিল একটি লোকের কবর। (সাহাবী শুনতে পেলেন) সে সূরা মুলক পাঠ করছেন। তা শেষ পর্যন্ত পাঠ করল। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি একটি কবরের ওপর আমার তাবু টানাই। আমি জানতামনা যে তা একটি কবর। তার মধ্যে একটি লোক সূরা মুলক পাঠ করছে (শুনলাম)। সে তা শেষ পর্যন্ত পাট করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বললেনঃ এটা কবরের আযাব প্রতিরোধকারী, এটা তার পাঠকারীকে কবরের আযাব থেকে বাঁচায়। (তিরমিযী)

٢٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ سُوْرَةً مِّنَ الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ

২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কুরআন মজীদে তিরিশটি আয়াত সম্বলিত একটি সূরা আছে। তা কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। সূরাটি হচ্ছে "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক।"– (তিরমিযী)

٣٠. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ اَلٓمٓ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ -

৩০। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা "আলিফ,–লা–ম, মী–ম তানযী'ল (সাজদাহ) এবং 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্‌ক' না পড়া পর্যন্ত ঘুম যেতনে না–(তিরমিযী)

সূরা ইখলাস কুরআনের এক–তৃতীয়াংশের সমান

٣١. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ، قَالُوْا

وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ) .

৩১। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক–তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? সাহাবাগণ বললেন, এক রাতে এক–তৃতীয়াংশ কুরআন কিভাবে পড়তে পারে? তিনি বললেনঃ "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" (সূরা ইখলাস) এক–তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান–(মুসলিম, ইমাম বুখারী এ হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরীর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন)।

পুরা কুরআন শরীফে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছেঃ

(এক) আহকাম বা আইন–কানুন, (দুই) নবীদের ঘটনাবলী অর্থাৎ ইতিহাস (তিন), আকায়েদ বা ইসলামী বিশ্বাসের শিক্ষা–প্রশিক্ষণ। যেহেতু আকায়েদের মূল হচ্ছে তৌহীদ এবং তৌহীদকে বাদ দিলে ইসলামী আকীদার কোন অর্থই বাকি থাকেনা। এজন্য সূরা ইখলাস তৌহীদের পূর্ণাংগ বর্ণনা হওয়ার কারণে এটাকে এক–তৃতীয়াংশের সমান সাব্যস্ত করা হয়েছে।

চিন্তা করুন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণের ধরন কতটা অতুলনীয় ছিল। তিনি এমন সব বাক্য ও কথার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন যার ফলে শিক্ষার্থীর মনে তা দ্রুত অংকিত হয়ে যেত এবং তার মানসপটে গেঁথে যেত। কোন ব্যক্তির মনে একথা দৃঢ়মুল করার জন্য অর্থাৎ সূরা ইখলাসের কি গুরুত্ব রয়েছে তা বুঝানোর জন্য কয়েক ঘন্টার বক্তৃতার প্রয়োজন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) মাত্র সামান্য কথার মাধ্যমে তা বোঝায়ে দিলেন এবং বললেন, যদি তোমরা সূরা ইখলাস একবার পাঠ কর তাহলে এটা যেন এক–তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করার সমতুল্য হয়ে গেল। এই একটি মাত্র বাক্যে এই সূরার যে গুরুত্ব মানুষের মনে দৃঢ়মূল হয়ে যায় তা কয়েক ঘন্টার বক্তৃতায়ও সম্ভব নয়। এটা ছিল রসূলুল্লার (সা) বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে তিনি সাহাবাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

সূরা ইখলাস –আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম

٣٢. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لاَصْحَابِهِ فِيْ صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ

اللّٰهُ اَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ، فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর অধিনায়ক বানিয়ে পাঠালেন। সে নিজের সংগীদের নামায পড়ানোর সময় সূরা ইখলাসের মাধ্যমে সর্বদা নিজের কিরাত শেষ করত। তারা যখন অভিযান থেকে ফিরে আসল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে একথা ব্যক্ত করলে, তিনি বললেনঃ তোমরা গিয়ে জিজ্ঞেস কর সে কেন এরূপ করেছে? সুতরাং তারা তাকে একথা জিজ্ঞেস করল। সে বলল, এই সূরার মধ্যে আল্লাহ তাআলার পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য আমি এ সূরাটি পড়তে ভালবাসি। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাকে গিয়ে সুসংবাদ দাও আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালবাসেন।–(বুখারী, মুসলিম)

যে সামরিক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং অংশ গ্রহণ করতেন না তাকে সারিয়াহ বলা হয়। আর যে সামরিক অভিযানে তিনি নিজে শরীক হতেন তাকে গাযওয়াহ বলা হয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের যুগে এবং পরবর্তীকালেও একটা উল্লেখযোগ্য কাল পর্যন্ত এই নিয়ম চালু ছিল যে, যে ব্যক্তি জামাআতের আমীর হত সে–ই দলের নামাযে ইমামতি করত। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কোন সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক হত তবে নামায পড়ানোর দায়িত্ব তার ওপরই থাকত। অনুরূপ ভাবে কেন্দ্রে খলীফা (ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান) নামাযে ইমামতি করতেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন। এখানে যে সামরিক অভিযানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার অধিনায়কের অভ্যাস ছিল তিনি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার পর একান্তভাবেই সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। একথা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোচরে আনা হল এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে এর কারণ জানা গেল তখন তিনি তাকে সুসংবাদ দিলেন, তুমি যখন এই সূরা পাঠ করতে এজন্য পছন্দ কর যে, এতে উত্তম পন্থায় আল্লাহ তাআলার পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে–তাই আল্লাহ তাআলাও তোমাকে ভালবাসেন।

পূর্ববর্তী হাদীসে বলা হয়েছে–সূরা ইখলাস এক–তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান। আর এখানে বলা হয়েছে– সূরা ইখলাসে সুন্দরভাবে তৌহীদের বর্ণনা থাকার কারণে যে ব্যক্তি এই সূরাকে পছন্দ করে রসূলুল্লাহ (স) তাকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

দুনিয়ার কোন কিতাবেই এত সংক্ষিপ্ত বাক্যে তৌহিদকে পূর্ণাংভাবে বর্ণনা করা হয়নি, যার মাধ্যমে দুনিয়ায় বিরাজমান সমস্ত গোমরাহীর মূল শিকড় একই সাথে কেটে ফেলা হয়েছে। এতো সংক্ষিপ্ত বাক্যে এতো বড় বিষয়বস্তু এমন পূর্ণাংগভাবে কোন আসমানী কিতাবেই বর্ণিত হয়নি। সমস্ত আসমানী কিতাব যা অবিকৃত বর্তমানে দুনিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এই বিষয়বস্তু অনুপস্থিত। এই ভিত্তিতে যে ব্যক্তি এটাকে বুঝতে চেষ্টা করে, এর প্রাণসত্তার সাথে পরিচয় লাভ করেছে সে এই সূরার সাথে গভীর ভালবাসা রাখে। স্বয়ং এই সূরার নাম সূরা ইখলাসই–এই নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে যে, এটা সেই সূরা যা খালেছ তৌহীদের শিক্ষা দেয়। তা এমন তৌহীদের শিক্ষা দেয় যার সাথে শিরকের নাম গন্ধ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনা। এ জন্য যে ব্যক্তি উল্লেখিত কারণে এই সূরার সাথে মহব্বত রাখে সে আল্লাহ তাআলারও প্রিয় বান্দাহ হিসাবে গণ্য হয়।

সূরা ইখলাসের প্রতি আকর্ষণ–বেহেশতে প্রবেশের কারণ

٣٣. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ:قَالَ اِنَّ حُبَّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ مَعْنَاهُ)

৩৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি এই সূরা ইখলাসকে ভালবাসি, তিনি বললেনঃ তোমার এই ভালবাসা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। (তিরমিযী, বুখারী)

জানা গেল যে, এই সূরার প্রতি ভালবাসা একটি স্থিরিকৃত ব্যাপার। কোন ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত এই কথার দ্বারাই হয়ে গেছে যে, এই সূরাটি তার প্রিয় ছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তির অন্তর শিরকের যাবতীয় মলিনতা থেকে সম্পূর্ণ পাক হওয়া এবং খালেছ তৌহীদ তার মন মগজে বদ্ধমূল হওয়া ছাড়া এই সূরার প্রেমিক হওয়া সম্ভব নয়। অন্তরে খালেছ তৌহীদ দৃঢ়মূল হয়ে যাওয়াটাই বেহেশতের চাবি। যদি তৌহীদের ধারণায় ত্রুটি থেকে যায় তাহলে বেহেশতের কোন প্রশ্নই উঠেনা। মানুষের জীবনে যদি অন্যান্য ত্রুটি–বিচ্যুতি থেকে থাকে তা আল্লাহ তাআলা

মাফ করে দিবেন, কিন্তু তৌহীদ বিশ্বাসের মধ্যে গোলমাল থাকলে তা ক্ষমার অযোগ্য।

যদি কারো মনে নির্ভেজাল তৌহীদ বদ্ধমূল হয়ে যায় তাহলে তার মধ্যে অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি খুব কমই অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু যদিওবা থেকে যায় তাহলে সে তওবা করার সৌভাগ্য লাভ করবে। মনে করুন যদি তওবা করার সুযোগও না পায় এবং সে তওবা করতে ভুলে গিয়ে থাকে তবুও আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তার ক্ষমা হয়ে যাবে। কেননা খালেছ তৌহীদ হচ্ছে এমনই এক বাস্তব সত্য–আল্লাহর প্রতি মানুষের বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী হওয়া যার ওপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি খালেছ তৌহীদের অনুসারী–সে আল্লাহর বিশ্বাসবাজনদের অন্তর্ভুক্ত। আর অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতকদের সাথে আল্লাহর আচরন যেরূপ হয়, তাঁর বিশ্বাসভাজনদের প্রতিও তাঁর আচরন তদ্রূপ নয়। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বলেছেন, এই সূরার প্রিয়পাত্র হওয়াটাই তোমার বেহেশতে প্রবেশের ফয়সালা করে দিয়েছে।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস–দুটি অতুলনীয় সূরা

٣٤. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ– (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৪। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেনঃ তুমি কি দেখেছ আজ রাতে এমন কতগুলো আয়াত নাযিল হয়েছে যার নযীর কখনো দেখা যায়নি? তা হচ্ছে কুল আউযু বি–রব্বিল ফালাক এবং কু আউযু বি–রব্বিন নাস সূরাদ্বয়। –(মুসলিম)

এখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে বলেছেন যে, এ দুটি অতুলনীয় সূরা, এর দৃষ্টান্ত কখনো পাওয়া যায়নি। এর কারণ হচ্ছে–পূর্বেকার আসমানী কিতাব গুলোতে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত কোন সূরার উল্লেখ নাই। এ সূরাদ্বয়ও অত্যন্ত সংক্ষেপে কিন্তু পূর্ণাংগ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় যে কারণে এ সূরা দুটির বিষয়বস্তু ভালভাবে হৃদয়াংগম করে নেয়া যায় তাহল–এটা মানুষকে যে কোন ধরনের শংসয়–সন্দেহ, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দান করে এবং যে কোন ব্যক্তি পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে হকের রাস্তায় চলতে পারে

প্রথম সূরাটিতে বলা হয়েছে—এই কথা বলে দাও যে, আমি সেই মহান রবের আশ্রয় প্রার্থনা করি যিনি ভোরের উন্মেষকারী, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে হেফাজতকারী, অন্ধকার রাতে আবির্ভাব হওয়া যাবতীয় ভয়–ভীতি ও শংকা থেকে মুক্তি দানকারী এবং যেসব দুষ্ট লোক যাদুটোনা ও অন্যান্য উপায়ে মানুষের ক্ষতি সাধনে তৎপর তাদের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দানকারী। দ্বিতীয় সূরায় বলা হয়েছে তুমি বলে দাও—আমি সেই মহান সত্তার আশ্রয় গ্রহন করছি যিনি মানুষের রব, মানুষের মালিক এবং মানুষের উপাস্য। যেসব মানুষ এবং শয়তানেরা অন্তরের মধ্যে সংশয়–সন্দেহ সৃষ্টি করে—আমি এদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

কোন ব্যক্তি যদি 'আউযু বি–রব্বিল ফালাক' এবং 'আউযু বি–রব্বিন নাস' বাক্যগুলো নিজের জবানে উচ্চারন করে এবং সে যেসব বিপর্যয় ও অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে—সেগুলোকে আবার ভয়ও করছে—তাহলে তার মুখ দিয়ে এই শব্দগুলো বের হওয়া নিরর্থক। যদি সে একনিষ্ঠ এবং হৃদয়ংগম করে একথাগুলো উচ্চারণ করে তাহলে তার দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ যে, কেউই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তার মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হওয়া উচিৎ যে, এখন কেউই তার কোন বিপর্যয় ঘটাতে পারবে না। কেননা সে মহান আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করেছে, যিনি এই মহা বিশ্বের মালিক এবং সমগ্র মানব কুলেরও একচ্ছত্র অধিপতি। যখন সে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করল এবং ঘোষণা করে দিল, এখন আমি আর কারো অনিষ্টের আশংকা করি না—এরপর তার আর ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন অর্থ থাকতে পারে না। মানুষ তো কেবল এমন সত্তারই আশ্রয় নিয়ে থাকে যার সম্পর্কে তার আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, সে তাকে আশ্রয় দেয়ার শক্তি রাখে। যদি কেউ আশ্রয় দেয়ার শক্তিই না রাখে তাহলে তার কাছে কেবল নির্বোধ ব্যক্তিই আশ্রয় চাইতে পারে। এক ব্যক্তি দ্বিবিধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে কারো আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এক, যে তাকে আশ্রয় দেবার মত ক্ষমতা রাখে। দুই, যাদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে ভেগে এসে তাঁর আচঁলে আশ্রয় নিচ্ছে—এদের সবার শক্তি ও ক্ষমতা তার সামনে মূল্যহীন। যতক্ষণ তার মধ্যে এ দুটি বিষয়ে প্রত্যয় সৃষ্টি না হবে, সে তার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। সে যদি এই প্রত্যয় সহকারে তার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে তার ভয়–ভীতি ও আশংকা বোধ করার কোন অর্থই হয় না।

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার এইরূপ শক্তি ও ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রেখে তাঁর রাস্তায় কাজ করার জন্য প্রবৃত্ত হয়ে যায় তাহলে সে কাউকে ভয় করতে পারে না। দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই—সে যার ভয় করতে পারে। সে সম্পূর্ণরূপে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় কাজ করবে এবং গোটা দুনিয়ার বাতিল শক্তির মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজের ভাইয়ের সাথে ফিরাউনের বিরুদ্ধে লাঠি নিয়ে পৌছে গেলেন। এতবড় বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে মাত্র দুটি প্রাণ কিভাবে রুখে দাঁড়ালেন? শুধু এইজন্য যে, আল্লাহর আশ্রয়ের ওপর তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল। যখন আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তখন পরাশক্তির বিরুদ্ধেও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ানো যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার কলেমা সমুন্নত করার জন্য সমগ্র দুনিয়ার বিরুদ্ধে কিভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন? কেবল আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা থাকার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার পিছনে আল্লাহর শক্তি রয়েছে, যিনি সমগ্র বিশ্ব এবং সমস্ত শক্তির মালিক।

অনুরূপভাবে যেসব লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেছে, আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করার জন্য সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্প রাখে–তাদেরও আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে এবং তাঁর আশ্রয়ের ওপর অবিচল বিশ্বাস থাকতে হবে–চাই তাদের কাছে উপায়-উপকরণ, সৈন্য সামন্ত এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র থাক বা না থাক। মানুষ এরূপ দুঃসাহস তখনই করতে পারে যখন আল্লাহর আশ্রয় সম্পর্কে তার পূর্ণ ঈমান থাকে। এ জন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এগুলো অতুলনীয় বাক্য যা এই দুটো সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা এতে যে কোন ধরনের বিপর্যয় এবং বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে কেবল আল্লাহ তাআলার পক্ষপুটে আশ্রয় নেয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে একজন মুমিনের অন্তরে তাঁর দেয়া আশ্রয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

কুরআনের শব্দ গুলোর মধ্যেও বরকত রয়েছে

٣٥. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ-(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে যখন বিছানায় শুইতে যেতেন, নিজের উভয় হাতের তালু একত্রে মিলিয়ে তাতে সূরা "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাক এবং কুল

আউযু বি-রব্বিন-নাস" পড়ে ফুঁ দিতেন। অতপর তিনি নিজের হাতের তালুদ্বয় সমস্ত দেহে তা যতদূর পৌঁছতে সক্ষম ফিরাতেন। প্রথমে মাথায়, অতপর মুখমন্ডলে, তারপর দেহের সামনের ভাগে। তিনি এভাবে তিনবার করতেন। (বোখারী ও মুসলিম)

কালামে ইলাহীর শব্দভান্ডারে, তার উচ্চারণে এবং এর বিষয়বস্তু সবকিছুর মধ্যেই কল্যাণ, প্রাচুর্য ও বরকত লুকিয়ে আছে। এর সম্পূর্ণটাই বরকত আর বরকত, কল্যাণ আর প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে ভাবে আল্লাহর কালামকে বুঝতেন এবং তদনুযায়ী কাজ করতেন এবং এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, অনুরূপভাবে তিনি কালামে ইলাহীর মধ্যে নিহিত অন্যান্য বরকত লাভ করারও চেষ্টা করতেন। যেমন, কুরআনের আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁ দেয়া এবং নিজে পান করা বা অন্যকে পান করানো, তা পড়ে হাতে ফুঁ দেয়া অতপর তা দেহে মর্দন করা-এভাবে তিনি কুরআনের বরকতের প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য কোন দিকই ছাড়তেন না।

আজো যদি কোন ব্যক্তি এরূপ করে তবে তা করতে পারে এবং এটাও বরকতের কারণ হবে। তবে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই বরকতের ফায়দা কেবল এমন ব্যক্তিই লাভ করতে পারে, যে কুরআনের বাহ্যিক দিকের সাথে সাথে এর বাতেনী দিকের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখে। যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের উদ্দেশ্যের বিপরীত জীবন যাপন করে, আবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়ে নিজের ওপর ফুঁও দেয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে-সে অবশেষে কোন ধরনের অনিষ্ট ও বিপর্যয় থেকে খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করছে? সে তো নিজেকে অনিষ্ট দিয়ে পরিপূর্ণ করে রেখেছে-এখন সে কোন্ অনিষ্ট থেকে পানাহ চাচ্ছে? সে যে সূদ খেয়ে সমাজের অনিষ্ট সাধন করেছে-এখন পুলিশ বাহিনী যেন তাকে গ্রেপ্তার না করে-এ জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছে? এই জন্য এ কথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে, যে ব্যক্তি বাস্তব ক্ষেত্রে কুরআনের লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করছে কেবল সে-ই এর বরকত ও কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে। এরপর কুরআনের শব্দগুলোর মধ্যে যে বরকত রয়েছে তা সে অনায়াসে লাভ করতে পারবে। কিন্তু যে ব্যক্তি রাতদিন কুরআনের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং নিজের কথায় ও কাজে কুরআনের নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করছে তার জন্য এই বরকত ও কল্যাণ হতে পারে না।

কিয়ামতের দিন পক্ষ অবলম্বনকারী তিনটি জিনিস-
কুরআন, আমানত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক

٣٦.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلٰثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اَلْقُرْاٰنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ- لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ - وَالْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِىْ : اَلَا مَنْ وَّصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ -

৩৬। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কিয়ামতের দিন তিনটি জিনিস আরশের নীচে থাকবে। এক, কুরআন–যা বান্দার পক্ষে অথবা বিপক্ষে আরজি পেশ করবে। এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুটি দিক রয়েছে। দুই, আমানত এবং তিন, আত্মীয়তার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ফরিয়াদ করে বলবে, যে ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করেছে–আল্লাহ তাআলাও তাকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করেছে–আল্লাহ–তাআলাও তাকে ছিন্ন করবেন। (ইমাম বাগাবীর শরহে সুন্নাহ)

কিয়ামতের দিন কুরআন মজীদ, আমানত এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের আল্লাহ পাকের আরশের নীচে থাকার অর্থ এই নয় যে, উল্লেখিত জিনিসগুলো সেখানে মানুষের আকৃতিতে দাঁড়িয়ে থাকবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে–এই তিনটি সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা কিয়ামতের দিন মানুষের মোকদ্দমা সমূহের মীমাংসা করার জন্য সামনেই উপস্থিত থাকবে। এ তিনটি জিনিসকে দৃষ্টান্তের আকারে পেশ করা হয়েছে।–যেমন কোন রাষ্ট্রপ্রধানের দরবারে তার তিনজন উচ্চপদস্থ প্রিয় ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়ে আছে। এবং তারা বলে দিচ্ছে–কোন ব্যক্তি কেমন প্রকৃতির এবং কি ধরনের ব্যবহার পাওয়ার উপযোগী। এভাবে যেন একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য সর্ব প্রথম যে জিনিসটি সামনে আসবে তা হচ্ছে–কুরআন। এই কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইউহাজ্জুল ইবাদ"। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, কুরআন বান্দাদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করবে। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বান্দাদের স্বপক্ষে মামলা পরিচালনা করবে।

এই ধরনের বক্তব্য পূর্বের একটি হাদীসেও এসেছে–"আল–কুরআনু হুজ্জাতুন লাকা আও আলাইকা।" অর্থাৎ, কুরআন হয় তোমার স্বপক্ষে দলীল হবে অথবা তোমার বিপক্ষে। কুরআন এসে যাওয়ার পর এখন ব্যাপারটি দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। যদি তোমরা কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে থাক তাহলে এটা তোমাদের অনুকূলে সাক্ষ্য হবে। আর যদি তোমরা কুরআনের নির্দেশের বিপরীত কাজ কর, তাহলে এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হবে। কোন ব্যক্তিকে যখন আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে তখন যদি এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদের আকারে যে নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন–সে তদনুযায়ী

আমল করার চেষ্টা করেছে, তখন কুরআনই তার পক্ষে প্রমাণ পেশ করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে আরজ করবে–এই ব্যক্তি দুনিয়াতে আপনার নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করে এসেছে। তাই তাকে এই পুরস্কার দান করা হোক। কিন্তু যে ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশ পাওয়ার পরও তার বিপরীত কাজ করেছে–কুরআন তার বিরুদ্ধে মামলা চালাবে।

আরো বলা হয়েছে, কুরআনের একটি বাহ্যিক দিক এবং একটি অপ্রকাশ্য দিক রয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে–কুরআনের একটি দিক হচ্ছে এর পরিষ্কার শব্দমালা যা প্রতিটি ব্যক্তিই পড়তে পারে। আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে এই শব্দমালার অর্থ ও এর লক্ষ্য। কিয়ামতের দিন কুরআনের শব্দও সাক্ষী হবে এবং এর অর্থও সাক্ষী হবে। কুরআন মজীদে এমনি হুকুম বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, অমুক কাজ নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি সেই নিষিদ্ধ কাজটি করল। এই অবস্থায় কুরআনের শব্দসমূহ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে।

অনুরূপ ভাবে কুরআন মজিদের শব্দমালার মধ্যে সেই তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যার মাধ্যমে জানা যায় যে, কুরআন মানুষের মধ্যে কোন প্রকারের নৈতিকতার পরিপুষ্টি সাধন করতে চায় আর কোন ধরনের নৈতিকতার বিলুপ্তি চায়; কোন ধরনের জিনিস আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় এবং কোন জিনিস অপছন্দনীয়। এভাবে কুরআন মজীদ আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় জীবন প্রণালী কি তার নীল নকশাও পেশ করে। এখন যদি কোন ব্যক্তি এর বিপরীত জীবন–প্রণালী অনুসরণ করে তাহলে গোটা কুরআনই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। পুরা কুরআনের প্রাণসত্তা ও তার তাৎপর্য এই ব্যক্তির বিপক্ষে দাঁড়াবে।

কুরআনের পরে দ্বিতীয় যে জিনিস আরশের নীচে বান্দাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তা হচ্ছে আমানত। এখানে আমানত শব্দটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। মানুষের মাঝে আমানতের যে সাধারণ অর্থ প্রচলিত আছে তা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে টাকা–পয়সা, অলংকারাদি অথবা অন্য কোন জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই বিশ্বাসে জমা রাখল যে, দাবী করার সাথে সাথে তা পুনরায় ফেরত পাওয়া যাবে। এটা আমানতের একটি সীমিত ধারণা। অন্যথায় আমানতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে–কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তার কাছে নিজের কোন অধিকার এই ভরসায় গচ্ছিত রাখে যে, সে তার এই হক আত্মসাৎ করবে না। এটাই হচ্ছে আমানত। যদি কোন ব্যক্তি এই আমানত আত্মসাৎ করে তাহলে কিয়ামতের দিন তা তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হয়ে দাঁড়াবে।

এখন দেখুন আমাদের কাছে সর্বপ্রথম আমানত হচ্ছে আমাদের দেহ যা আমাদের প্রতিপালক আমাদের কাছে সোপর্দ করেছেন। এর চেয়ে মূল্যবান জিনিস দুনিয়াতে

কিছু নেই। সমস্ত শরীরের কথা তো প্রশ্নাতীত, এর কোন একটি শক্তি বা অংগের চেয়েও মূল্যবান জিনিস আর নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহর এই জমীন। এখানে আমাদের প্রতিটি লোকের কাছে যতটুকু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে–কারো হাতে বেশী কারো হাতে কম এসবই আমানত। এরপর দেখুন মানবীয় ও সামাজিক সম্পর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুধু আমানত আর আমানত। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সূচনা বিবাহের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সমগ্র মানব সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের দাম্পত্য সম্পর্ক। এখান থেকে গোটা মানব সমাজের সূচনা। এ সবই আমাদের কাছে আমানত। নারী একজন পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এই আত্মবিশ্বাসের ওপর সে নিজেকে তার কাছে সপে দেয় যে, সে একজন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ। সে তার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। অপরদিকে পুরুষ একজন স্ত্রীলোকের দায়দায়িত্ব সারা জীবনের জন্য এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজের কাঁধে তুলে নেয় যে, সে একজন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত মহিলা। সে তার সাথে সহযোগিতা করবে, সে তার ধন–সম্পদ মান–ইজ্জত ইত্যাদি যা কিছুই তার তত্ত্বাবধানে রাখবে– সে এর কোনরূপ খেয়ানত করবে না। অনুরূপভাবে সন্তানদের অস্তিত্বও আত্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তিশীল। পিতা–মাতার প্রতি সন্তানদের এই আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, তারা তাদের কল্যাণেই ব্রতী হবে। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাদের কোন অমঙ্গল করবে না এবং তাদের স্বার্থের কোনরূপ ক্ষতি করবে না। সন্তানদের স্বভাব–প্রকৃতির মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস নিহিত রয়েছে। যে সন্তান কেবল ভূমিষ্ট হল তার স্বভাবের মধ্যে এই গুণ বর্তমান রয়েছে। মনে হয় যেন তার এবং তার পিতা–মাতার মাঝে একটি অলিখিত চুক্তি হয়ে আছে।

অনুরূপ ভাবে কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে অপরের হাতে এই বিশ্বাসে তুলে দেয় যে, সে ভদ্র এবং সমভ্রান্ত। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কন্যাকে তার বংশের মান–মর্যাদার ওপর ভরসা করেই বিয়ে করে। আত্মীয়তার ব্যাপারটিও এরূপ–একে অপরকে নির্ভরযোগ্য মনে করে। স্বয়ং এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর ওপর নির্ভর করে থাকে। সে বিশ্বাস করে তার প্রতিবেশী দেয়াল ভেংগে অবৈধভাবে তার ঘরে অনুপ্রবেশ করবে না। এভাবে আপনি আপনার গোটা জীবনে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, সমস্ত মানবীয় সম্পর্ক এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্থাপিত হচ্ছে যে, অপর পক্ষ তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

কোন দেশের পুরা সরকারী ব্যবস্থা একটি আমানত। গোটা জাতি তার আমানত সরকারের হাতে তুলে দেয়। তারা নিজেদের ভবিষ্যত এবং নিজেদের যাবতীয় উপায় উপকরণ– জাতীয় সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়। সরকারের যত কর্মচারী রয়েছে তাদের হাতে জাতির আমানতই তুলে দেয়া হয়। জাতীয় সংসদের সদস্যদের হাতে জাতি তার পুরা আমানতই সপে দেয়। লাখ লাখ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত

সেনাবাহিনীর কথা চিন্তা করুন। জাতি তাদেরকে সুসংগঠিত করে দেশের অভ্যন্তরে রেখে দেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিসমূহে তাদেরকে স্থাপন করে। নিজেদের খরচে তাদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র কিনে দেয় এবং জাতীয় আয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাদের পেছনে ব্যয় করা হয়। তাদেরকে এই বিশ্বাসে সুসংগঠিত করে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে যে, তারা দেশ ও জাতির হেফাজতের দায়িত্ব পালন করবে। এবং তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সম্পাদন করার ব্যাপারে খেয়ানত করবে না।

এখন যদি এসব আমানতের চতুর্দিক থেকে খেয়ানত হতে থাকে তাহলে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্য এই আমানত সেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা কিয়ামতের দিন মানুষের পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দেয়ার জন্য উপস্থিত হবে। যে যত বেশী খেয়ানত করেছে সে ততখানি শক্তভাবে পাকড়াও হবে। আর যে ব্যক্তি আমানতের যত বেশী হক আদায় করেছে সে তত অধিক পরিমাণে আল্লাহর তরফ থেকে পুরস্কার লাভের অধিকারী হবে।

তৃতীয় যে জিনিস কিয়ামতের দিন অসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী হবে তা হচ্ছে 'আত্মীয়তার সম্পর্ক'-রেহেম। আত্মীয়তার সম্পর্ক এমন একটি জিনিস যার ওপর মানব সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছে। মানবীয় সভ্যতার সূচনা এভাবে হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি এবং তার সামনে যেসব আত্মীয়-স্বজন রয়েছে তাদের সমন্বয়ে একটি বংশ অথবা গোত্রের সৃষ্টি হয়। এভাবে যখন অসংখ্য বংশ এবং গোত্র একত্রিত হয় তখন একটি জাতির গোড়াপত্তন হয়। এসব কারণে কুরআন মজীদে আত্মীয়তার সম্পর্কের ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে মানবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির শিকড় কর্তনকারী জিনিস বলা হয়েছে। এ জন্য বলা হয়েছে রেহেম অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ক হচ্ছে সেই তৃতীয় জিনিস যার ভিত্তিতে কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে ফয়সালা করা হবে। এই দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক চিৎকার করে বলবে, যে ব্যক্তি আমাকে অটুট রেখেছে আল্লাহ তাআলা তাকে অটুট রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে কর্তন করেছে আল্লাহ তাআলাও তাকে ত্যাগ করবেন। যখন কোন ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি নির্দয় হয় এবং তাদের সাথে শীতল সম্পর্ক বজায় রাখে-সে দুনিয়াতে কারো বন্ধু হতে পারে না। যদি সে কারো বন্ধুরূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে বুঝতে হবে সে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে এবং নিজের কোন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য বন্ধুর বেশ ধারণ করেছে। যতক্ষণ তার স্বার্থ রক্ষা পাবে ততক্ষণই সে বন্ধু হয়ে থাকবে। যেখানে তার স্বার্থে আঘাত লাগবে- সেখানেই সে তার বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। কেননা এটা যথার্থই বাস্তবসম্মত কথা যে, যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে আপন বলে গ্রহণ করে না সে অপরের আপন কিভাবে হতে পারে। এ কারণেই কুরআন মজীদে আত্মীয়-সম্পর্ক অটুট রাখার ওপর এত অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এখানে হাদীসে উল্লেখিত শব্দে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কুরআনের অধিকারী ব্যক্তির মর্যাদা

৩৭. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَئُهَا -

৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কুরআনের সাথে সম্পর্ক রেখেছে (কিয়ামতের দিন) তাকে বলা হবে, কুরআন পাঠ কর এবং উপরে উঠতে থাক। তুমি দুনিয়াতে যে গতিতে থেমে থেমে কুরআন পাঠ করেছ–অনুরূপ গতিতে তা পাঠ করতে থাক। তোমার বাসস্থান হবে সেই সর্বশেষ আয়াত যা তুমি পাঠ করবে। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সাহেবে কুরআন বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক রেখেছে। যেমন, আমরা এমন ব্যক্তিকে মুহাদ্দিস বলি যিনি হাদীসের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখেন এবং এমন ব্যক্তিকে নামাযী বলি যিনি নামাযের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক রেখেছেন, কুরআন পাঠ করা, তা হৃদয়াংগম করা এবং তা নিয়ে চিন্তা গবেষণায় মশগুল থেকেছেন–তিনিই হলেন কুরআনের ধারক ও বাহক। কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে, তুমি কুরআন পাঠ করতে থাক এবং উন্নত স্তরের দিকে উন্নিত হতে থাক। তুমি যেখানে পৌছে কুরআন পাঠ সমাপ্ত করবে সেখানেই হবে তোমার মনযীল। অর্থাৎ যে স্থানে পৌছে তুমি কুরআনের সর্বশেষ আয়াত পড়বে সেখানেই হবে তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান। এ জন্যই বলা হয়েছে–তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে সুস্থে থেমে থেমে তা পাঠ কর। তাহলে তুমি সর্বোচ্চ মনযিলে পৌছে যেতে পারবে।

যার স্মৃতিপটে কুরআন নেই সে বিরান ঘর সমতুল্য

৩৮. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যার পেটে কুরআন নেই সে এমন একটি বিরান ঘর সমতুল্য যাতে বসবাসকারী কেউ নেই। (তিরমিযী, দারেমী)

যার বক্ষে কুরআনের কোন অংশ নেই সে এমন একটি বিধ্বস্ত বাড়ির সমতুল্য যাতে বসবাস করার মত কেউ নেই। তার মধ্যে কোন প্রাণশক্তি বর্তমান নেই। তার স্মৃতিপট লক্ষ্যশূণ্য। তার মধ্যে এমন কোন জিনিস নেই যার ভিত্তিতে তাকে সচেতন মানুষ বলা যেতে পারে।

আল্লাহর কালাম যাবতীয় কালাম থেকে শ্রেষ্ঠ

٢٧. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْاَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِىَ السَّائِلِيْنَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ-

৩৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মহান আল্লাহ তাআলা বলেনঃ কুরআন যে ব্যক্তিকে আমার যিকির এবং আমার কাছে দোয়া করা থেকে বিরত রেখেছে–আমি দোয়াকারী বা প্রার্থনাকারীদের যা দান করি তার চেয়ে উত্তম জিনিস তাকে দান করব। এরপর নবী (স) বলেনঃ কেননা সমস্ত কালামের ওপর আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে–যেভাবে সমস্ত সৃষ্টিকুলের ওপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (তিরমিযী, দারেমী, বায়হাকী)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কুরআনের চর্চায় এতটা মশগুল রয়েছে যে, অন্যান্য উপায়ে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার জন্য সে যিকির–আযকার করারও সময় পায়নি, এমনকি তার কাছে দোয়া করারও সুযোগ পায়নি, তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রার্থনাকারীদের আমি যত বড় জিনিসই দান করি না কেন, কুরআন পাঠকারীকে দোয়া করা ছাড়াই কুরআনের বরকতে এর চেয়েও উত্তম জিনিস দান করব।

এটা হাদীসে কুদসী। হাদীসে কুদসী হচ্ছে–যার মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা এরূপ বলেছেন। হাদীসে কু সী এবং কুরআনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, কুরআনের মতন ও (মূল পাঠ)

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নাযিল হয় এবং এর বিষয়বস্তুও আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব। তা কুরআনের অংশ হিসাবে নাযিল হয়। এ জন্যই জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন কুরআন নিয়ে আসতেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে দিতেন–এটা কুরআনের আয়াত। এবং তা আল্লাহ তাআলার নিজস্ব শব্দে এসেছে। অপর দিকে হাদীসে কুদসির ভাষা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজস্ব, কিন্তু এর ভাব এবং বিষয়বস্তু আল্লাহ তাআলার নিজস্ব যা তিনি তার নবীর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। কখনো কখনো হাদীসে কুদসির ভাষাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসে থাকে। কিন্তু তা কুরআনের অংশ হিসাবে আসে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্ন দোয়া শিখিয়েছেন। নামাযের মধ্যে যেসব যিকির পড়া হয় তা সবই আল্লাহ তাআলার শিখানো। কিন্তু তা কুরআনের অংশ বানানোর উদ্দেশ্যে শেখানো হয়নি। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁরই ভাষায় কোন বিষয় বস্তু নাযিল হলে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হত যে, তা কুরআনের সাথে যোগ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।

এই হাদীসে কুদসির অংশ "উতিয়াস সায়েলীন" পর্যন্ত শেষ হয়েছে। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টি জগতের ওপর আল্লাহ তাআলার যেরূপ মর্যাদা রয়েছে, যাবতীয় কথার ওপর তাঁর কথার অনুরূপ মর্যাদা রয়েছে–কেননা তা আল্লাহ তাআলার কালাম। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির তুলনায় যতটা শ্রেষ্ঠ, তাঁর কথাও সৃষ্টির কথার চেয়ে তত শ্রেষ্ঠ। উপরের কথার সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা যোগ করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কুরআন ছাড়া অন্য যে কোন দোয়া–দুরূদের কথাই বলা হোক না কেন মানুষের তৈরী কালাম, স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কালাম নয়। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের তৈরী কথা যতই উন্নত মানের ও মর্যাদাসম্পন্ন হোক না কেন তা আল্লাহর কালামের সামনে কিছুই নয়। আল্লাহর সামনে মানুষের যেই মর্যাদা, তাঁর কালামের সামনে তাদের রচিত এই কালামেরও ততটুকু মর্যাদা।

অতএব তোমরা সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আল্লাহ তাআলার এই কালামের পিছনে যতটা সময় ব্যয় করেছ–তা অতীব মূল্যবান কাজে ব্যয় হয়েছে। তোমরা যদি দোয়ার মধ্যে তোমাদের সময় ব্যয় কর তাহলে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান কাজেই তোমাদের সময় ব্যয় করলে। অতএব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করার পরিবর্তে কুরআন পাঠেই তার সময় ব্যয় করে তাহলে তাকে দোয়াকারীদের তুলনায় উত্তম জিনিস কেন দেয়া হবে।

কুরআনের প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকী

٤٠. عَنِ ابْنِ مَسعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: مَن قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا، لاَاَقُوْلُ الٓمّٓ حَرْفٌ– اَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَّمِيْمٌ حَرْفٌ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৪০। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করে তার জন্য এর বিনিময়ে একটি নেকী রয়েছে। (কুরআনে এই মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে) প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব রয়েছে। আমি একথা বলছি না যে, 'আলিফ, লাম, মীম' একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। (তিরমিযী, দারেমী)

অর্থাৎ, 'আলিফ–লাম–মীম' কয়েকটি হরফের সমন্বয়। প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে এবং প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে দশগুণ পুরস্কার রয়েছে।

কুরআন প্রতিটি যুগের ফিতনা থেকে রক্ষাকারী

٤١. عَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِقَالَ مَرَرْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَاذَا النَّاسُ يَخُوْضُوْنَ فِى الْاَحَادِيْثِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَلِىٍ فَاَخْبَرْتُه فَقَالَ اَوَقَدْ فَعَلُوْهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَمَا انِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَلاَانَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ، قُلْتُ مَاالْمَخْرَجُ مِنْهَا يَارَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ كِتَابُ اللهِ، فِيْهِ نَبَأُ مَاقَبْلَكُمْ وَخَبَرُمَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَابَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ

مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى فِىْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ ، هُوَ الَّذِىْ لَاتَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلَاتَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَايَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا يَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ ، هُوَ الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

৪১। তাবেঈ হারিস আল–অ'ওয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি (কুফার) মসজিদে বসা লোকদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম লোকেরা– বাজে গল্প–গুজবে মেতে আছে। আমি হযরত আলীর (রা) কাছে হাযির হলাম। আমি তাকে অবহিত করলাম যে, লোকেরা এভাবে মসজিদে বসে বাজে গল্প–গুজব করছে। তিনি বললেন, বাস্তবিকই কি লোকেরা তাই করছে। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ খবরদার! অচিরেই এমন যুগ আসবে যাতে বিপর্যয় শুরু হবে। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এই বিপর্যয় থেকে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাব (এই বিপর্যয় থেকে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা সম্ভব)। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি সমূহের কি অবস্থা হয়েছিল তাও এই কিতাবে আছে। তোমাদের পরে আসা লোকদের ওপর দিয়ে কী অতিবাহিত হবে তাও এতে আছে। তোমাদের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা করার পন্থাও এতে বিবৃত হয়েছে। এই কুরআন হচ্ছে সত্য–মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালাকারি কিতাব। এটা কোন হাসি–ঠাট্টার বস্তু নয়। যে অহংকারী তা পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন। যে ব্যক্তি এই কুরআন পরিত্যাগ করে অন্যত্র হেদায়াত তালাশ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবেন। এই কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার মজবুত রশি এবং প্রজ্ঞাময় যিকির ও সত্য সরল পথ। তা অবলম্বন করলে প্রবৃত্তি কখনো বিপথগামী হয় না। তা জবানে উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়

না। জ্ঞানীগণ কখনো এর দ্বারা পরিতৃপ্ত ও বিতৃষ্ণ হয় না। একে যতই পাঠ কর তা পুরাতন হয় না। এর বিস্ময়কর তথ্য সমূহের অন্ত নেই। এটা শুনে জিনেরা স্থির থাকতে পারেনি, এমনকি তারা বলে উঠল, "আমরা এমন এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি যা সৎ পথের সন্ধান দেয়। অতএব আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি।" (সূরা জিন। ১, ২)

যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলে সে সত্য কথা বলে। যে ব্যক্তি তদনুযায়ী কাজ করবে সে পুরস্কার পাবে। যে ব্যক্তি তদনুযায়ী ফয়সালা করবে সে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করতে পারবে। যে ব্যক্তি লোকদের এই কুরআন অনুসরণ করার দিকে ডাকে সে তাদের সরল পথেই ডাকে। (তিরমিযী, দায়েমী)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম সৌন্দর্য এই বলেছেন যে, কুরআনে এটাও বলা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহ কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ অনুসরণ করার কারণে তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যারা ভ্রান্ত পথে চলেছিল তাদেরইবা কি পরিণতি হয়েছিল। কুরআনে এও বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের কি পরিণতি হবে এবং সঠিক রাস্তার অনুসারীদের ভাগ্যে কি ধরনের কল্যাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। কুরআনে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে এর মীমাংসা কিভাবে হওয়া উচিৎ।

'হুয়াল ফাসলু' বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে–কুরআন মজীদ চূড়ান্ত ফয়সালাকারী কথা বলে এবং পূর্ণ গাম্ভীর্যের সাথে বলে, এর মধ্যে হাসি–ঠাট্টা ও উপহাস মূলক এমন কোন কথা বলা হয়নি, যা মানা বা না–মানায় কোন পার্থক্য সূচিত হয় না।

অতপর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কুরআনকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথা থেকে হেদায়াত লাভের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাআলা তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবেন। এর অর্থ হচ্ছে–এই কিতাব ছাড়া এখন আর কোথাও থেকে হেদায়াত পাওয়া যেতে পারে না। যদি অন্য কোন উৎসের দিকে ধাবিত হয় তাহলে গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না।

আরো বলা হয়েছে, এই কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার মজবুত রশি। অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে–বান্দাহ এবং তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। যে ব্যক্তি কুরআনকে শক্তভাবে ধারণ করল, খোদার সাথে তার গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হল। যে ব্যক্তি কুরআনকে ছেড়ে দিল, সে আল্লাহ তালার সাথে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলল।

কুরআনের প্রজ্ঞাময় যিকির হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, এটা এমন এক নসীহত যার গোটাটাই হিকমাত, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করে।

আরো বলা হয়েছে, কুরআন অবলম্বন করলে প্রবৃত্তি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হতে পারে না। এর অর্থ হচ্ছে–যদি কোন ব্যক্তি কুরআনকে নিজের পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করে, তা থেকে হেদায়াত লাভ করার চেষ্টা করে এবং তার জীবনে যেসব সমস্যা ও বিষয়াদি উপস্থিত হয় তার সমাধানের জন্য যদি সে কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তার প্রবৃত্তি তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না এবং অন্য কারো চিন্তাধারাও তাকে ভ্রান্ত পথে নিতে পারবে না। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি পূর্ব থেকে নিজের চিন্তাধারাকে তার মনমগজে শক্তভাবে বসিয়ে নেয় এবং কুরআনকেও তার চিন্তাধারা অনুযায়ী ঢালাই করতে চায়–তাহলে এই পন্থা তাকে তার আকাশ-কুসুম কল্পনা থেকে মুক্ত করতে পারে না। হাঁ যদি কোন ব্যক্তি কুরআন থেকেই পথনির্দেশ লাভ করতে চায় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখানে যা কিছু পাওয়া যাবে তা সে মেনে নিবে এবং যা কিছু এখানে পাওয়া যাবে না তা সে গ্রহণ করবে না–তাহলে এমন ব্যক্তিকে তার নিজের কল্পনা বিলাসও পথভ্রষ্ট করতে পারবে না এবং অন্যের চিন্তাধারাও তাকে ভ্রান্ত পথে নিতে সক্ষম হবে না।

অতপর বলা হয়েছে, কারো মুখের ভাষা কুরআনের মধ্যে কোনরূপ ভেজাল মিশাতে সক্ষম হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কুরআনকে এমন ভাবে সংরক্ষিত করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি এর মধ্যে কোন মানুষের কথার মিশ্রণ ঘটাতে চায় তা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এ ব্যাপারটি একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা–আল্লাহ তাআলা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথা এমন সময়ে বলেছেন, যখন এই কুরআন কেবল পেশ করা শুরু হয়েছে। কিন্তু আজ চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়েছে। তারপরও এটা চূড়ান্ত কথা হিসাবে বিরাজ করছে যে, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এর সাথে কোন কিছু সংমিশ্রণ করতে সক্ষম হয়নি। সে সময় আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিলনা যে, কুরআনে কোনরূপ মিশ্রণ ঘটাতে পারবে না। ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে একথা বলা হয়েছিল। আজ শত শত বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যা কিছু বলা হয়েছিল বাস্তবিক পক্ষেই তা ছিল হক। এরই নাম হচ্ছে মু'জিযা।

আরো বলা হয়েছে, আলেমগণ কখনো তা থেকে পরিতৃপ্ত হয় না। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আলেম সে কুরআন তিলাওয়াত, তা অনুধাবন এবং তা নিয়ে চিন্তা গবেষণায় জীবন অতিবাহিত করে দেয় কিন্তু কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। তার কাছে এমন কোন সময় আসবে না যখন সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে যে, কুরআন থেকে তার যা শেখার ছিল তা সে শিখে নিয়েছে এবং বুঝে নিয়েছে এবং এখন তার আর কোন জ্ঞানের দরকার নেই। আজ পর্যন্ত কোন আলেমই বলতে পারেনি যে, সে কুরআন থেকে পরিতৃপ্ত হয়েছে, তার যা কিছু অর্জন করার প্রয়োজন ছিল তা সে অর্জন করে নিয়েছে, এখন আর তার অতিরিক্ত কিছু শেখার প্রয়োজন নেই।

অতপর বলা হয়েছে, কুরআন যতবারই পাঠ কর না কেন তা কখনো পুরান হবে না। যত উন্নত মানের কিতাবই হোক–আপনি দুই–চার, দশ–বিশবার তা পড়তেই শেষে বিরক্ত হয়ে যাবেন। তারপর আর তা পড়তে মন চাইবে না। কিন্তু কুরআন হচ্ছে এমন এক অনন্য কিতাব যা জীবনভর পাঠ করা হয়, বারবার পাঠ করা হয় কিন্তু তবুও মন পরিতৃপ্ত হয় না। বিশেষ করে সূরা ফাতিহা তো দিনের মধ্যে কয়েক বার পাঠ করা হয় কিন্তু কখনো বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয় না যে, কতদিন ধরে লোক একই জিনিস বারবার পাঠ করছে। এটাও কুরআন মজীদের এক অনন্য মু'জিযা এবং এর অসাধারণ সৌন্দর্যের একটি নিদর্শন।

আরো বলা হয়েছে, কুরআন মজীদের রহস্য কখনো শেষ হবার নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, কুরআন পাঠ, এ নিয়ে চিন্তা–গবেষণা করতে এবং তথ্যানুসন্ধান করতে করতে মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার রহস্য কখনো শেষ হয় না। কখনো কখনো এমনও হয় যে, মানুষ একাধারে চল্লিশ–পঞ্চাশ বছর ধরে কুরআনের অধ্যয়নে কাটিয়ে দেয়ার পর কোন এক সময় কুরআন খুলে পড়তে থাকে। তখন তার সামনে এমন কোন আয়াত এসে যায় যা পাঠ করে মনে হয় যেন আজই সে এ আয়াতটি প্রথম পাঠ করছে। তা থেকে এমন বিষয়বস্তু তার সামনে বেরিয়ে আসে যা জীবনভর অধ্যয়নেও সে লাভ করতে পারেনি। এ জন্য রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এর রহস্য কখনো শেষ হবার নয়।

কুরআন মজীদের মর্মবাণী শুনে জিনদের ঈমান আনার ঘটনা সূরা জিন এবং সূরা আহকাফে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন এমন প্রভাবশালী বক্তব্য পেশ করে–মানুষ তো মানুষ জিনেরাও যদি একগুঁয়েমি, গোড়ামি এবং হঠকারিতা পরিহার করে উন্মুক্ত মন নিয়ে কুরআনের বাণী শুনে তাহলে তাদেরও এ সাক্ষী না দিয়ে উপায় থাকে না যে, কুরআন সঠিক পথের দিক নির্দেশ দান করে এবং এর উপর ঈমাণ এনে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

কুরআন মজীদের এসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনাগত ভবিষ্যতে যেসব ফিৎনা ও বিপর্যয় দেখা দেবে তা থেকে বাঁচার মাধ্যম এই কুরআন ছাড়া আর কিছুই নয়। একথাও পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, কুরআন মজীদে এমন জিনিস রয়েছে যার কারণে তা কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় মানব জাতিকে যে কোন ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে।

কুরআন চর্চাকারীর পিতামাতাকে
নূরের টুপি পরিধান করানো হবে

٤٦. عَنْ مُعَاذِنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا-

৪২। মুআয-আল-জুহানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে-কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে নূরের টুপি পরিয়ে দেয়া হবে। সূর্য যদি দুনিয়াতে তোমাদের ঘরে নেমে আসে তাহলে এর যে আলো হবে-ঐ টুপির তার চেয়েও সৌন্দর্যময় আলো হবে। অতএব যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী যাবতীয় কাজ করে তার প্রতি আল্লাহ তাআলার কি পরিমাণ অনুগ্রহ হতে পারে বলে তোমাদের ধারণা? (আহমদ, আবু দাউদ)

এখানে এমন পিতামাতার কথা বলা হয়নি যারা নিজেদের সন্তানদের কুরআন অধ্যয়ন করতে বাধা দেয়। এবং কুরআন পাঠকারী ছেলেদের মোল্লা হয়ে গেছে বলে টিটকারী দেয় এবং বলে, এখন সে আর আমাদের কোন কাজে লাগার উপযোগী নয়। এ আর কি পার্থিব কাজ করবে-এতো কুরআন পড়ায় লেগে গেছে। এখানে এমন পিতামাতার কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের সন্তানদের কুরআন পড়িয়েছে। এবং তাদের এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছে যে, তাদের জীবদ্দশায় এবং তাদের মৃত্যুর পরও তারা কুরআন পড়তে অভ্যস্ত রয়েছে এবং তদনুযায়ী যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। তার এই কুরআন পাঠ শুধু তার জন্যই পুরস্কার বয়ে নিয়ে আসবে না বরং তার পিতা মাতাকেও পুরস্কৃত করা হবে। আর সেই পুরস্কার হচ্ছে কিয়ামতের দিন তাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ, গৌরবময় ও আলোক উদ্ভাসিত টুপি পরিয়ে দেয়া হবে। এ থেকেই অনুমান করা যায়, যে ব্যক্তি নিজে এই কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়-তার ওপর আল্লাহ তাআলার কি পরিমাণ অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এবং সে কত কি পুরস্কার পাবে।

কুরআনের হেফাজত না করা হলে তা দ্রুত ভুলে যাবে

٤٣. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) -

৪৩। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কুরআন মজীদকে স্মৃতিপটে ধরে রাখার এবং সংরক্ষণ করার দিকে লক্ষ্য দাও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন। উট যেভাবে দড়ি ছিঁড়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে পলায়ন করার চেষ্টা করে–কুরআন সেভাবে এবং তার চেয়েও দ্রুত স্মৃতিপট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্ত করার পর তা স্মরণশক্তির আধারে ধরে রাখার জন্য যদি চিন্তা ভাবনা না করে এবং বারবার অধ্যয়ন না করে তাহলে তা মানুষের মন থেকে পলায়ন করে থাকে–যেভাবে উট তার রশি ছিঁড়ে পলায়ন করার চেষ্টা করে। এর কারণ হচ্ছে–মানুষ যতক্ষণ সর্বশক্তি নিয়োগ করে তা স্মৃতিপটে ধরে রাখার চেষ্টা না করে ততক্ষণ তার আত্মা কুরআনকে গ্রহণ করতে পারে না। যদি এটা না করা হয় তাহলে সে কুরআনকে তার স্মৃতিপট থেকে ঢিলা করে দেয় এবং এর ফলে তা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কেননা কুরআন তার ওপর যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে–তা থেকে মুক্ত হওয়ার দুর্বলতা তার মধ্যে বর্তমান রয়েছে। কুরআন তার জন্য যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে সে তা অতিক্রম করতে চায়। যে ব্যক্তি নফসের গোলাম হয়ে যায় এবং নিজের নফসকে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য বাধ্য করে না সে কখনো কখনো কুরআনের বানী শুনে ঘাবড়িয়ে যায়–না জানি এমন কোন আয়াত এসে যায় যা তাকে ভ্রান্ত ও নাজায়েজ কাজ করা থেকে বাধা দিয়ে বসে। এ জন্য বলা হয়েছে, কুরআন শরীফ মুখস্ত করার পর তা স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করার জন্য চেষ্টা কর। অন্যথায় তা উটের রশি ছিঁড়ে পলায়ন করার ন্যায় তোমার স্মৃতিপট থেকে পলায়ন করবে।

কুরআন মুখস্ত করে তা ভুলে যাওয়া জঘন্য অপরাধ

٤٤. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِئْسَ مَالِاَحَدِهِمْ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ: بِعُقُلِهَا) ـ

৪৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির জন্য এটা খুবই খারাপ কথা

যে, সে বলে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। (আসল কথা হচ্ছে তার অবহেলার কারণে) তাকে এটা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কুরআনকে কণ্ঠস্থ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা কর। কেননা তা পলায়নপর উটের চেয়েও দ্রুত মানুষের বক্ষস্থল থেকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে। –(বুখারী, মুসলিম–মুসলিমের বর্ণনায় আছে, উট তার বন্ধন থেকে যেভাবে ছুটে পালানোর চেষ্টা করে)।

এখানেও একই কথা ভিন্ন ভংগিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কুরআন মজীদ মুখস্ত করার পর তা ভুলে যাওয়া এবং এই বলা যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি–এটা খুবই খারাপ কথা। মূলত তার ভুলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সে কুরআনের কোন পরোয়া করেনি এবং তা মুখস্ত করার পর সেদিকে আর লক্ষ্য দেয়নি। যেহেতু সে আল্লাহ তাআলার কালামের প্রতি মনোযোগ দেয়নি এ জন্য আল্লাহ তাআলাও তাকে তা ভুলিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর কালাম এমন ব্যক্তির কাছে রাখা পছন্দ করেন না যে তার সমাদরকারী নয়। এই জন্য বলা হয়েছে, কুরআনকে মুখস্ত রাখার চেষ্টা কর এবং তা কণ্ঠস্থ করার পর পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর না। অন্যথায় উট বন্ধনমুক্ত হয়ে যেভাবে পালাবার চেষ্টা করে–অনুরূপভাবে কুরআনও বক্ষস্থল থেকে বের হয়ে চলে যায়।

কুরআন মুখস্তকারীর দৃষ্টান্ত

٤٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ– (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কুরআন মুখস্তকারী এমন ব্যক্তি সদৃশ যার কাছে বাঁধা উট রয়েছে। যদি সে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহলে তা তার কাছে থাকবে। আর যদি সে এটাকে আযাদ করে দেয় তাহলে তা ভেগে পালাবে। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে তিনটি বর্ণনায় একই বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন। এ থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে লোকদের মনে একথা বদ্ধমূল করিয়েছেন যে, যার যতটুকু পরিমাণ কুরআন মুখস্ত আছে সে যেন তা মুখস্ত রাখার চেষ্টা করে। তা যদি

স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করার চেষ্টা না কর এবং বারবার তা পাঠ না কর তাহলে এটা তোমাদের মন থেকে ছুটে যাবে।

আপনি দেখে থাকবেন, যারা কুরআনের হাফেজ তাদেরকে সবসময় কুরআন পড়তে হয়। যদি তারা রমযান মাসে কুরআন শুনাতে চায় তাহলে এ জন্য তাকে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। এর কারণ হচ্ছে, মানুষ কুরআন মুখস্ত করার পর যদি তা সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা না করে তাহলে তা খুব দ্রুত তার স্মৃতিপট থেকে বেরিয়েচলেযায়।

মনোনিবেশ সহকারে ও একাগ্র চিত্তে কুরআন পাঠ কর

٤٦. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْرَأُوا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ، فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিল যতক্ষণ কুরআনের সাথে লেগে থাকে ততক্ষণ তা পাঠ কর। যখন আর পাঠে মন বসে না তখন উঠে যাও (অর্থাৎ পড়া বন্ধ কর)। (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মানুষ যেন এমন অবস্থায় কুরআন পাঠ না করে যখন তার মন কুরআনের দিকে পূর্ণরূপে নিবিষ্ট হচ্ছে না। সে গভীর মনোনিবেশ সহকারে ও আগ্রহের সাথে যতটা সম্ভব কুরআন পাঠ করবে। মূল বিষয় মনযিলের পর মনযিল কুরআন পড়ে যাওয়া নয়। বরং পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে এবং অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ংগম করে পড়াই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এটা নয় যে, আপনি এক পারা কুরআন পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন–তখন আপনি এমন অবস্থায় বসে কুরআন পড়ছেন যে, আপনার মনোযোগ মোটেই সেদিকে নেই। এর চেয়ে বরং আপনি গভীর মনোযোগ সহকারে এক রুকু পাঠ করুন। মানুষ যদি তা করতে না পারে তাহলে মনযিলের পর মনযিল কুরআন পাঠ করে কি হবে? এ জন্যই বলা হয়েছে, কুরআন পড়ার সময় যদি মন ছুটে যায় তাহলে পড়া বন্ধ করে দাও।

রসূলুল্লাহর (স) কিরাআত পাঠের পদ্ধতি

٤٧. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللّٰهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ—

৪৭। কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করা হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাআত পাঠের ধরন কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, তিনি শব্দগুলো টেনে টেনে (অর্থাৎ পূর্ণাংগ ভাবে উচ্চারণ করে) পড়তেন। অতপর আনাস (রা) "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" পাঠ করে শুনালেন এবং প্রতিটি শব্দ টেনে টেনে আদায় করলেন। বিসমিল্লাহ, আর-রহমান, আর-রাহীম, (আল্লাহ, রহমান এবং রহীম শব্দকটি টেনে টেনে পড়লেন) (বুখারী)

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত গতিতে কুরআন পড়তেন না বরং প্রতিটি শব্দ টেনে টেনে পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করে পাঠ করতেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি অস্বাভাবিক পন্থায় কুরআন পড়তেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি প্রতিটি শব্দ ধীরস্থিরভাবে এবং পূর্ণাংগভাবে উচ্চারণ করে এমন ভংগিতে পাঠ করতেন যে, পড়ার সময় মানুষের মনমগজ পূর্ণভাবে সেদিকে নিয়োজিত হত যে-কি পাঠ করা হচ্ছে এবং এর তাৎপর্য কি?

মহা নবীর (স) সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়

٤٨. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَااَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَااَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ.

৪৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা কোন কথা এতটা মনোযোগ সহকারে শুনেন না যতটা মনোযোগ সহকারে কোন নবীর কণ্ঠস্বর শুনে থাকেন-যখন তিনি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করেন। (বুখারী, মুসলিম)

٤٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَااَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَااَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهٖ— (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ একজন নবী যখন সুললিত কণ্ঠে উচ্চ স্বরে কুরআন পাঠ করেন–তখন আল্লাহ তাআলা তার পাঠ যতটা যত্ন সহকারে শুনেন অন্য কোন কিছু ততটা যত্নসহকারে শুনেন না। (বুখারী, মুসলিম)

পূর্ববর্তী হাদীস এবং এ হাদীসের মূল বক্তব্য একই। এর অর্থ হচ্ছে, সুললিত কণ্ঠে নবীর কুরআন পাঠ এমন এক জিনিস যার প্রতি আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক আকর্ষণ রয়েছে। এ জন্য তিনি নবীর কুরআন পাঠ যতটা মনোযোগ সহকারে শুনেন তদ্রূপ অন্য কিছু শুনেন না।

যে ব্যক্তি কুরআনকে নিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় না–সে আমাদের নয়

٥٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِى) ـ

৫০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ করে না অথবা কুরআনকে পেয়ে অন্য সবকিছু থেকে বিমুখ হয় না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী)

এখানে 'সুমধুর স্বর'–এর অর্থ কি তা ভালভাবে হৃদয়াংগম করে নেয়া প্রয়োজন। কুরআনকে সুললিত কণ্ঠে পাঠ করা এক কথা, আর তা গানের সুরে পাঠ করা অন্য কথা। সুমধুর কণ্ঠে পড়া হচ্ছে এই যে, মানুষ কুরআনকে উত্তম পদ্ধতিতে, উত্তম সুরে পাঠ করবে। তাহলে কোন শ্রবনকারী উপস্থিত থাকলে তার পাঠ সে মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। উত্তম সুরে পাঠ করার মধ্যে কেবল কণ্ঠস্বর উত্তম হওয়াই নয়–বরং সে এমন পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করবে–যেন সে নিজেও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। কুরআন পাঠ করার ভংগি এরূপ হওয়া উচিৎ যে, সে যে বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত পাঠ করছে তদনুযায়ী তার কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ ভংগির মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হবে এবং সেই আয়াতের প্রভাবও তার মধ্যে সঞ্চারিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি শাস্তি সম্পর্কিত কোন আয়াত এসে যায় তাহলে তার অবস্থা এবং উচ্চারণ ভংগিও এমন হবে যেন তার মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ক্রিয়াশীল রয়েছে। যদি সে সওয়াব অথবা আখেরাতের সুযোগ–সুবিধা সম্পর্কিত কোন আয়াত পাঠ করে, তখন তার মধ্যে আনন্দ ও খুশির

ভাব জাগ্রত হবে। সে যদি কোন প্রশ্নবোধক আয়াত পাঠ করে তখন সে তা প্রশ্নবোধক বাক্যের ধরন অনুযায়ী পাঠ করবে। পাঠক কুরআন শরীফ এভাবে নিজে হৃদয়াংগম করবে এবং প্রভাবান্বিত হয়ে পাঠ করবে। শ্রবণকারী যেন শুধু তার মধুর সুরের দ্বারাই প্রভাবিত না হয়, বরং তার প্রভাবও যেন সে গ্রহণ করতে পারে– যেমন একজন উন্নত মানের বক্তার বক্তৃতার প্রভাব তার শ্রোতাদের ওপর পড়ে থাকে। এদিকে যদি লক্ষ্য না দেয়া হয় এবং গানের সুরে কুরআন পাঠ করা হয়–তাহলে সে কুরআনের সমঝদার নয়। বর্তমান যুগের পরিভাষায় এর নাম সংস্কৃতি তো রাখা যায়, কিন্তু তা প্রকৃত অর্থে কুরআন তিলাওয়াত হতে পারে না। সুর এবং লয়ের মাধ্যমে কুরআন পাঠ সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ করার সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না।

'তাগান্না বিল–কুরআন'–এর আরেক অর্থ হচ্ছে এই যে,কুরআনকে নিয়ে মানুষ দুনিয়ার অন্য সবকিছুর মুখাপেক্ষীহীন হয়ে যাবে। সে কুরআন মজীদকে আয়-উপার্জনের হাতিয়ারে পরিণত করবে না। বরং সে কুরআনের ধারক হয়ে–যে মহান খোদার এই কালাম–তাঁর ওপরই ভরসা করবে। কারো কাছে সে হাত পাতবে না এবং কারো সমনে তার মাথা নত হবে না। সে কাউকেও ভয় করবে না, কারো কাছে কিছু আশাও করবে না। যদি এটা না হয় তাহলে সে কুরআনকে তো ভিক্ষার পাত্র বানিয়েছে–কিন্তু সে কুরআনকে পেয়েও দুনিয়াতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারেনি।

রসূলুল্লাহ (স), কুরআন এবং সত্যের সাক্ষ্য দান

٥١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِقْرَأْ عَلَىَّ قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اَتَيْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ : فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا، قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ، فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ـ

৫১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের ওপর থাকা অবস্থায় আমাকে বললেনঃ "আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও।" আমি আরজ করলাম, আমি আপনাকে কুরআন পাঠ করে শুনাব? অথচ তা আপনার ওপরই নাযিল হচ্ছে!

তিনি বললেনঃ "আমি অপরের মুখে কুরআন পাঠ শুনতে চাই।" অতএব আমি সূরা নিসা তিলাওয়াত করতে থাকলাম। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছলাম- "আমি যখন প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এই সমস্ত সম্পর্কে- তোমাকে (হে মুহাম্মদ) সাক্ষী হিসাবে পেশ করব তখন তারা কি করবে" তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "আচ্ছা যথেষ্ট হয়েছে।" হঠাৎ আমার দৃষ্টি তাঁর চেহারার ওপর পতিত হলে আমি দেখলাম-তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে-(বুখারী, মুসলিম)।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির পর থেকে এই দুনিয়ায় যত লোক এসেছে তারা সবাই তাঁর উম্মাত। যদি তারা তাঁর ওপর ঈমান এনে থাকে তাহলে এক অর্থে তারা তাঁর উম্মাত। আর যদি তারা ঈমান না এনে থাকে তাহলে অন্য অর্থে তারা তাঁর উম্মাত। কেননা, একেত যেসব লোক তাঁর ওপর ঈমাণ এনে থাকবে তারা তাঁর উম্মাত। দ্বিতীয়ত যেসব লোকের কাছে তাঁকে নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে তারাও তাঁর উম্মাত। রসূলুল্লাহকে (স) যেহেতু সমগ্র মানব জাতির কাছে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে, এ জন্য তাঁর নবুয়াত প্রাপ্তি থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোকের আবির্ভাব হবে তারা সবাই তাঁর উম্মাত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মুখে সূরা নিসার আয়াত শুনে অশ্রুসজল হয়ে পড়লেন কেন? এ ব্যাপারটি গম্ভীরভাবে চিন্তা করুন।

আখেরাতে আল্লাহর আদালতে যখন সব জাতিকে উপস্থিত করা হবে এবং প্রত্যেক জাতির ওপর নিজ নিজ নবীকে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করানো হবে-তিনি তখন সাক্ষী দেবেন, আমি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ সমূহ তাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছি। তখনই তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জাত (পূর্ণাংগ প্রমাণ) সম্পন্ন হবে। নবীর পক্ষ থেকে যদি এ ব্যাপারে কোন ত্রুটি থেকে গিয়ে থাকে (আল্লাহ না করুন) তাহলে তিনি আল্লাহর বাণী পূর্ণরূপে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করার সাক্ষী দিতে পারেন না। নবী যদি এই সাক্ষ্য না দিতে পারেন (যদিও এরূপ হবে না) তাহলে তাঁর উম্মাতগণ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে এবং মোকদ্দমার সাক্ষ্যও খতম হয়ে যায়।

নিজের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর অনুভূতি ছিল। নবী (স) যখন উল্লেখিত আয়াত শুনলেন তখন এই অনুভূতির ফলশ্রুতিতেই তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি কত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছেন যে, আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের আবির্ভাব হবে-তাঁর মাধ্যমেই তাদের ওপর আল্লাহর হুজ্জাত (চূড়ান্ত প্রমাণ) পূর্ণ হবে। এই অনুভূতিই তাঁকে অস্থির করে রেখেছিল। তিনি সব সময়ই ভাবতেন, এই হুজ্জাত

পুরা করার ক্ষেত্রে আমার যদি সামান্য পরিমাণ ত্রুটিও থেকে যায় তাহলে এই উম্মাতকে গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে আমাকেই পাকড়াও করা হবে।

গভীরভাবে চিন্তা করুন, এর চেয়ে বড় যিম্মাদারী কি কোন মানুষের হতে পারে? আর এর চেয়েও কি কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ হতে পারে যে, সেই যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানব জাতির সামনে আল্লাহ তাআলার হুজ্জাত পুরা করার দায়িত্ব এককভাবে এক ব্যক্তির উপর পড়বে। কার্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গুরুত্বপূর্ণ পদেই সমাসীন ছিলেন। এই কঠিন যিম্মাদারীর অনুভূতিই তাঁর কোমরকে নুব্জ করে দিত। এমনকি আল্লাহ তাআলা তাঁকে শান্ত্বনা দেয়ার জন্য এ আয়াত নাযিল করেনঃ

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ - الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ -

আমি কি আপনার ওপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে রাখিনি যা আপনার কোমর ভেংগে দিচ্ছিল?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে এই মহান এবং কঠিন দায়িত্বের অনুভূতি রাখতেন, অপর দিকে এটা সব সময় তাঁকে অস্থির করে রাখত, আমি যাদের হেদায়াতের পথে ডাকছি তারা কেন তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে— এবং কেনইবা তারা নিজেদের জন্য একটি ভয়াবহ পরিণতি নির্দিষ্ট করে নিচ্ছে? যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَنْ لاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ -

"আপনি মনে হয় এই চিন্তায়ই নিজের জীবনটাকে শেষ করে দেবেন যে, এরা কেন ইমাণ আনছে না"–(সূরা শুআরাঃ ৩)।

এ কারণেই তিনি যখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) এই আয়াত (সূরা নিসা) পাঠ করতে শুনলেন তখন তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং তিনি বললেন, আচ্ছা! হয়েছে, আর নয়, থেমে যাও, এখন আর সামনে অগ্রসর হতে হবেনা।

কুরআনী ইলমের বরকতে উবাই ইবনে কা'বের (রা) মর্যাদা

٥٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ: اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ

أَللّٰهُ سَمَّانِيْ لَكَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ: لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، قَالَ وَسَمَّانِيْ، قَالَ نَعَمْ، فَبَكٰى

৫২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইবনে কা'বকে (রা) বললেনঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাই। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ তাআলা কি আমার নাম উল্লেখ করে আপনাকে এ কথা বলেছেন? তিনি বললেনঃ হাঁ। উবাই (রা) পুনরায় বললেন, সত্যিই কি মহাবিশ্বের প্রতিপালকের দরবারে আমার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে? তিনি বললেনঃ হাঁ। আনাস (রা) বলেন, একথা শুনে উবাই ইবনে ক'বের (রা) দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। অপর এক বর্ণনায় আছেঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে "লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ" সূরা পাঠ করে শুনাই। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ তাআলা কি আমার নাম উল্লেখ করে আপনাকে এ কথা বলেছেন? তিনি বললেনঃ হাঁ। এতে উবাই ইবনে কা'ব (রা) (আবেগাপ্লুত হয়ে) কেঁদে দিলেন।–(বুখারী, মুসলিম)।

হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) এমন কি বিশেষত্ব ছিল যার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা তাকে এত উচ্চ স্থান, এত বড় সম্মান ও পদমর্যাদা দান করলেন? হাদীস সমূহের বর্ণনায় এসেছে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কুরআনের জ্ঞানে সর্বাধিক পারদর্শী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা যে অসংখ্য পন্থায় সাহাবাদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন তার মধ্যে একটি ছিল, যে সাহাবীর মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিভা এবং অসাধারণ যোগ্যতার সমাবেশ ঘটত– আল্লাহ তাআলা তার সাথে বিশেষ ব্যবহার করতেন। যাতে এই বিশেষ যোগ্যতা ও প্রতিভার লালন ও বিকাশ ঘটতে পারে এবং তার শৌর্যবীর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এজন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেদায়াত দান করা হয়েছে, আপনি উবাই ইবনে কা'বকে (রা) কুরআন পাঠ করে শুনান। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) এটা জানতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, আল্লাহু আকবার; আমার এই মর্যাদা যে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমার নাম নিয়ে আমার উল্লেখ করা হয়েছে।

আপনি এ থেকে অনুমান করতে পারেন, সাহাবাদের অন্তরে কুরআন মজীদের প্রতি কি পরিমাণ মহব্বত ও আকর্ষণ ছিল। তাদের কত সম্মান ও মর্যাদা ছিল যে,

তারা আল্লাহ তায়ালার নজরে পড়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে বিশেষ আচরণ করেছেন।

কুরআনকে শত্রুর এলাকায় নিয়ে যেওনা

٥٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : لَاتُسَافِرُوْا بِالْقُرْاٰنِ - فَاِنِّىْ لَا اٰمَنُ اَنْ يَّنَالَهُ الْعَدُوُّ-

৫৩। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন সাথে নিয়ে শত্রু এলাকায় সফর করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, কুরআন শরীফ সাথে নিয়ে দুশমনদের এলাকায় যেওনা কেননা শত্রুর হাতে পড়ে যাওয়া সম্পর্কে আমি নিরাপদ মনে করিনা।

মোটকথা যে এলাকায় কুরআন নিয়ে গেলে তার অসম্মান হওয়ার আশংকা আছে সেখানে জেনেশুনে কুরআন নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

আসহাবে সুফফার ফযীলাত

٥٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسْتُ فِىْ عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرْىِ وَقَارِئٌ يَّقْرَأُ عَلَيْنَا اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَاكُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ، قُلْنَاكُنَّا نَسْتَمِعُ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ، فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ اُمِرْتُ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِىْ مَعَهُمْ، قَالَ فَجَلَسَ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهٖ فِيْنَا،

ثُمَّ قَالَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهٗ فَقَالَ اَبْشِرُوْا يَامَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَّذٰلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ)

৫৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন দুর্বল (গরীব ও নিঃস্ব) মুহাজিরদের একটি দলের সাথে বসা ছিলাম। তারা নিজেদের লজ্জা নিবারণের জন্য পরস্পর লেগে বসেছিল। কেননা এ সময় তাদের কাছে সম্পূর্ণ শরীর ঢাকার মত কাপড় ছিল না। এই মুহাজিরদের মধ্যেকার একজন কারী আমাদের কুরআন পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং আমাদের দলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে গেলেন তখন কুরআন পাঠকারী চুপ হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সালাম দিলেন। অতপর তিনি বললেনঃ তোমরা কি করছিলে? আমরা আরজ করলাম, আমরা আল্লাহর কিতাব শুনছিলাম। তিনি বললেনঃ মহান আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোকদের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন যাদের সম্পর্কে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন তাদের সংগী হয়ে ধৈর্য ধারণ করি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, তিনি আমাদের মাঝে এমনভাবে বসে গেলেন যে, আমাদের এবং তাঁর মাঝে কোন পার্থক্য থাকলনা। (মনে হচ্ছিল তিনি আমাদের মধ্যেকারই একজন। কোন বিশেষ ব্যক্তি নন।) অতপর তিনি হাতের ইশারায় বললেনঃ এরূপ বস। অতএব তারা বৃত্তাকারে বসে গেলেন এবং তাদের সবার চেহারা তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। অতপর তিনি বললেনঃ নিঃস্ব মুহাজিরদের জামায়াত! তোমরা পূর্ণাংগ নূরের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যা তোমরা কিয়ামতের দিন লাভ করবে। তোমরা ধনীদের চেয়ে অর্ধদিন আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আখেরাতের অর্ধদিন দুনিয়ার পাঁচশো বছরের সমান। (আবু দাউদ)

দুর্বল মুহাজের বলতে বৃদ্ধ অথবা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল লোকদের বুঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ হচ্ছে নিতান্ত গরীব এবং আর্থিক অনটনে জর্জরিত। অর্থাৎ যেসব মুহাজির কোন অর্থ–সম্পদ ছাড়াই শুধু এক কাপড়ে নিজেদের বাড়িঘর পরিত্যাগ করে চলে আসছিলেন। তাদের কাছে না ছিল পরনের কাপড়, না ছিল খাবার সামগ্রি, আর না ছিল মাথা গোজার ঠাঁই। কিন্তু আল্লাহর দীনের সাথে তাদের

সংগ্রহ এবং কুরআনের প্রতি তাদের আকর্ষণ এমনই ছিল যে, অবসর বসে থেকে অনর্থক কথাবার্তায় সময় কাটানোর পরিবর্তে তারা আল্লাহর কালাম শুনতেন এবং শুনাতেন।

এ স্থানে ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, কুরআন মজীদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা কেন বলা হয়েছিল, তাদের সাথে ধৈর্য ধারণ কর এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন কেন? একথা কুরআন মজীদের এমন স্থানে বলা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে পথ নির্দেশ দান করেছেন যে—মক্কার এই বড় বড় সরদার এবং ধনিক শ্রেণীর লোকেরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার কোন পরোয়াই করবেনা। এবং কখনো এ চিন্তায়ও লেগে যাবে না যে—তাদের কেউ যদি তোমার দলে ভীড়ে যেতো তাহলে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্বের অসীলায় এ দীনের প্রসার ঘটতো বরং তার পরিবর্তে যেসব লোক দরিদ্র এবং কাংগাল কিন্তু ঈমান গ্রহণ করে তোমার কাছে এসেছে–তুমি তাদের নিত্যসাথী হয়ে তাদের সাথে ধৈর্য ধারণ কর, তাদের সুখ–দুঃখের ভাগী হয়ে যাও এবং তাদের সাহচর্যে আশ্বস্ত থাক।[১]

কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর দীনের প্রচারের জন্য বের হয় তখন তার আকাংখা থাকে, প্রভাবশালী লোকেরা তার ডাকে সাড়া দিক। তাহলে তার আগমনে কোথাও দীনের কাজের প্রসার ঘটবে। এই অবস্থায় যখন গরীব ও দুর্বল লোকেরা, যাদের সমাজে বিশেষ কোন পদমর্যাদা নেই, এসে তার আহবানে নিজেদের উৎসাহ প্রকাশ

---

১. সূরা কাহাফে বলা হয়েছেঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَاتَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُ ج تُرِيْدُوْنَ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا– وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (سُوْرَةُ الكهف ايت ٢٨–٢٩)

"হে নবী। তোমার দলকে সেই লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখ যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তোষ লাভের সন্ধানী হয়ে সকাল ও সন্ধায় তাঁকে ডাকে। আর তাদের দিক থেকে কখনো অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা। তুমি কি দুনিয়ার চাকচিক্য ও জাঁকজমক পছন্দ কর? এমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য কর না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণশূন্য করে দিয়েছি এবং যে লোক নিজের নফসের খাহেশের অনুসরণ করে চলার নীতি গ্রহণ করেছে, আর যার কর্মনীতি সীমা লংঘনমূলক। পরিষ্কার বলে দাও, এই মহাসত্য এসেছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে। এখন যার ইচ্ছা তা মান্য করবে আর যার ইচ্ছা তা অমান্য করবে, অস্বীকার করবে" –(২৮ ও ২৯ নম্বর আয়াত)

করে এবং এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করে দেয়—তখন সে চিন্তা করে এই যেসব লোকের সমাজে কোন স্থান নেই তাদের নিয়ে আমি কি করব? এরা যদি ভেড়ার পালের মতও জমা হয়ে যায় তবুও এসব গুরুত্বহীন লোকের দ্বারা দীনের আর কি প্রসার ঘটবে! দীনের জন্য কাজ করতে উদ্যোগী লোকের এরূপ চিন্তা আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় নয়। এজন্য তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেদায়েত দান করলেন যে, তিনি যেন ঈমান গ্রহণকারী সাধারণ মর্যাদা সম্পন্ন গরীব লোকদের কম গুরুত্বপূর্ণ বা গরুত্বহীন মনে না করেন, তিনি যেন তাদের সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকেন, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি যেন তাদেরকে উপেক্ষা করে বড় বড় শেখ ও প্রতিপত্তিশীল লোকদের দলে আনার চিন্তায় বিভোর হয়ে না যান।

মক্কার কাফেরদের নেতারাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রূপ করে বলত—কই তাঁর ওপর তো মক্কার কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ঈমান আনছেনা, জাতির বিচক্ষণ ও প্রভাবশালী লোক—যাদের কাছে লোকেরা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালার জন্য আসে, তাদের কেউই তো তাঁর সাথে নেই। এই নীচু শ্রেণীর লোকেরাই তাঁর ওপর ঈমান এনেছে এবং তিনি মনে করেছেন এদের নিয়েই তিনি দুনিয়াতে আল্লাহর দীন ছড়িয়ে দেবেন। তাদের এই বিদ্রূপের জবাবে এই কথা বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে মূলত সেই হচ্ছে মূল্যবান মানুষ। যে ব্যক্তি ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করছে সে না জ্ঞানী হতে পারে আর না কোন নেতা অথবা শেখ হতে পারে। আজ যদিও কোন ব্যক্তি শেখ হয়ে আছে কিন্তু আগামী কাল তার এই শেখগিরি খতম হয়ে যাবে এবং এই মর্যাদাহীন, দুস্থ গরীব লোকেরাই তাদের গদি উলটিয়ে দেবে। এ জন্য বলা হয়েছে, যেসব লোক তোমার দলে এসে গেছে তাদের সাথে দৈর্য ধারণ কর এবং তাদের দিক থেকে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই দুর্দশাগ্রস্ত মুহাজিরদের দেখলেন যে, তারা কতটা আগ্রহ ও ভালবাসা সহকারে কুরআন পড়া শুনছেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া তিনি এমন লোকদের আমার সংগী করেছেন যাদের সাথে আমাকেও সবর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে হুজুর (স) এজন্য শুকরিয়া আদায় করলেন যে,তাঁর সাথে এমন লোকরা এসে গেছে যাদের মধ্যে এই যোগ্যতা বর্তমান রয়েছে এবং তারা এতটা মজবুত ঈমানের অধিকারী যে আল্লাহর দীনের খাতিরে নিজেদের বাড়িঘর, সন্তান–সন্ততি সব কিছু ছেড়েচলেএসেছে।

অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই মুহাজিরদের সুসংবাদ দিলেন যে, তারা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের অধিকারী হবে এবং তারা সম্পদশালী লোকদের চেয়ে পাঁচশো বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শান্তনার বাণী শুনিয়ে বললেন, আল্লাহর দীনের খাতিরে তোমরা যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করছ, যে ভয়ভীতির মধ্যে তোমাদের জীবন যাপন করতে হচ্ছে, যে জন্য তোমরা নিজেদের বাড়িঘড় ত্যাগ করেছ এবং দুঃখ-দারিদ্রকে আরাম-আয়েশের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছ-এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের অধিকারী হবে এবং ধনী লোকদের অর্ধদিন আগে বেহেশতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে। কিয়ামতের অর্ধ দিন দুনিয়ার পাঁচশো বছরের সমান।

আখেরাতের অর্ধ দিবস এবং এটা দুনিয়ার পাঁচশো বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য কোন ব্যাক্তিই নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। ঐ জগতের সময়ের মানদন্ড এই দুনিয়ার চেয়ে ভিন্নতর এবং প্রতিটি জগতেই সময়ের মানদন্ড ভিন্নরূপ-একথা হৃদয়ংগম করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (স) সময়ের উল্লেখ করেছেন। এ জন্য এর খোজ-খবর ও অযথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে লিপ্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। একথা সেখানে গিয়েই জানা যাবে সেখানকার সময় ও কালের অর্থ কি এবং এর মানদন্ডই বা কি?

সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ কর

৫৫. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ -

৫৫। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সর্বাধিক সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ কর। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

অর্থাৎ, যতদূর সম্ভব সুন্দর উচ্চারণ ভংগীতে এবং মার্জিত আওয়াজে কুরআন শরীফ পাঠ কর। এমন অমার্জিত পন্থায় পাঠ করোনা যার ফলে অন্তর কুরআনের দিকে ধাবিত হওয়ার পরিবর্তে আরো দূরে চলে যায়।

যেমন এক পারস্য কবি বলেছেনঃ

گرتد قران بدین نمط خوانی + ببری دونق مسلمانی

কুরআন পড়া শিখে তা ভুলে যাওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার

৫৬. عَنْ سَعْدِبْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَامِنِ امْرِءٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلاَّ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجْذَمَ – (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالدَّارِمِىُّ) ـ

৫৬। সা'দ ইবনে উ'বাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ার পর তা ভুলে যায়—সে কিয়ামতের দিন কুষ্ঠ অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাযির হবে। (আবু দাউদ,দারেমী)

হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেছেন যে, এ হাদীসে কুষ্ঠ অবস্থা হওয়ার অর্থ শুধু দৈহিকভাবে কুষ্ঠ হওয়া নয়, বরং একথা প্রবাদবাক্য হিসাবে বলা হয়েছে এবং এর অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ অসহায়। যেমন আমরা বলে থাকি, মাথায় আকাশ ভেংগে পড়েছে। মূলত মাথায় আকাশ ভেংগে পড়েনি। বরং মানুষের ঘাড়ে কঠিন বিপদ এসে চাপলেই এরূপ বলা হয়। অনুরূপভাবে আরবী ভাষায় কারো অসহায়ত্ব প্রকাশ করার জন্য বলা হয়ে থাকে—তার হাত কাটা। ইতিপূর্বে একটি হাদীসে এসেছে, "আলকুরআন হুজ্জাতুন লাকা আও আলাইকা।" অর্থাৎ "কুরআন তোমার পক্ষে প্রমাণ হবে অথবা বিপক্ষে পমাণ হয়ে দাঁড়াবে।" এখন এমন এক ব্যক্তির কথা চিন্তা করুন যার ঈমান আছে এবং সেই ঈমানের ভিত্তিতে সে কুরআন পড়েছে, কিন্তু তা পড়ার পর ফের ভুলে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তার কাছে এখন কোন্ প্রমাণ অবশিষ্ট আছে যা সে আল্লাহর দরবারে পেশ করবে? কুরআন ভুলে যাওয়ার পর তো তার প্রমাণ তার হাত থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন তার কাছে এমন কোন জিনিস নেই যা সে নিজের নির্দোষিতার স্বপক্ষে পেশ করবে। এ হচ্ছে সেই অসহায় অবস্থা—কিয়ামতের দিন সে যাতে লিপ্ত হবে। এটা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সে হাত কাটা অবস্থায় উঠবে।

তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করনা

৫৭. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ-

৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করেছে সে কুরআন বুঝেনি। (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে গোটা কুরআন শরীফ পড়ে ফেলে তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, সে কুরআনের কি বুঝল। এজন্য রসূলুল্লাহর (স)

নির্দেশ হচ্ছে কমপক্ষে তিন দিনে কুরআন খতম কর। এর চেয়ে অধিক সময় নিয়ে কুরআন খতম করলে তা আরো ভাল, কিন্তু এর কম সময় নয়। কেননা যদি কোন ব্যক্তি দৈনিক দশপারা কুরআন মধ্যম গতির চেয়েও দ্রুত পাঠ করে তাহলে এ অবস্থায় সে কুরআনের কিছুই বুঝতে পারবেনা।

প্রকাশ্যে অথবা নিরবে কুরআন পড়ার দৃষ্টান্ত

৫৮. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৫৮। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রকাশ্য আওয়াজে কুরআন পড়ে সে ঐ ব্যক্তির মত যে প্রকাশ্যে দান–খয়রাত করে। আর যে ব্যক্তি নিরবে কুরআন পাঠ করে সে গোপনে দান–খয়রাতকারীর সাথে তুল্য। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

অর্থাৎ নিজ নিজ স্থানে উভয় পন্থায়ই কুরআন পাঠ করায় সওয়াবও লাভ হয় এবং উপকারও হয়। কোন ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে দান খয়রাত করে তাহলে অন্যদের ওপরও এর প্রভাব পড়তে পারে এবং তারও দানখয়রাত করার দিকে মনোনিবেশ বাড়তে পারে। তাদের অন্তরেও আল্লাহর রাস্তায় দানখয়রাত করার আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। অপরদিকে কোন ব্যক্তি যদি গোপনে দান খয়রাত করে তাহলে তার মধ্যে নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা সৃষ্টি হয় এবং সে রিয়াকারী বা প্রদর্শনেচ্ছা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। কুরআন পাঠ করার মধ্যে ফায়দা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বান্দাদের পর্যন্ত এর শিক্ষা পৌঁছে যায় এবং লোকদের মাঝে কুরআন পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে অস্পষ্ট আওয়াজে বা গোপনে কুরআন পাঠ করার মধ্যে ফায়দা হচ্ছে এই যে, এভাবে কোন ব্যক্তি ইখলাস ও নিষ্ঠা সহকারে এবং প্রদর্শনেচ্ছা মুক্ত হয়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য কুরআন পাঠ করতে পারে এবং এর মধ্যে অন্য কোনরূপ আবেগের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে না।

কুরআনের ওপর কার ঈমান গ্রহণযোগ্য

৫৯. عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ–

৫৯। সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআনের হারাম করা জিনিসকে হালাল করে নিয়েছে—সে কুরআনের ওপর ঈমান আনেনি। (তিরমিযী)।

কুরআন যে আল্লাহর কালাম—এর উপর ঈমান আনা এবং কুরআনে হারাম ঘোষিত জিনিসকে হালাল বানানো–এদুটি জিনিস একত্রে জমা হতে পারে না। কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা মানুষের কাছে কতিপয় গ্রহণ করার এবং কতিপয় জিনিস পরিত্যাগ করার দাবী করে। যে ব্যক্তি কুরআনের হারামকৃত জিনিসকে হালাল করে নিয়েছে এবং সে কুরআনকে বাস্তবিকই আল্লাহর কিতাব বলে বিশ্বাস করে—তার জীবন যাপন থেকে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না–তার কুরআন মানার দাবী করায় এবং তা পাঠ করায় কি ফায়দা আছে?

নবী আলাইহিস সালামের কিরাআত পাঠের ধরন

٦٠. عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَئَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا–

৬০। ইয়া'লা ইবনে মামলাক (তাবেঈ) তেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে কিরাআত পাঠ করতেন? তখন উম্মে সালামা (রা) এমনভাবে কুরআন পাঠ করে শুনালেন যাতে প্রতিটি অক্ষর পৃথকভাবে কানে আসল। (তিরমিযী, আবু দাউদ,নাসাই)

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) খুব দ্রুত গতিতে কুরআন পাঠ করতেন না, বরং তিনি এমনভাবে কুরআন পাঠ করতেন যে, লোকেরা প্রতিটি অক্ষর পরিকার শুনতে পেত। সামনে হাদীসে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসবে।

٦١. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ– يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ...

৬১। উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম টুকরা টুকরা করে কুরআন পাঠ করতেন (অর্থাৎ প্রতিটি বাক্য পৃথক পৃথক করে পড়তেন—অতপর থামতেন।(তিরমিযী)

এখানে আরো পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) দ্রুত গতিতে বা তাড়াহুড়া করে কুরআন পাঠ করতেন না। অর্থাৎ তিনি একই নিশ্বাসে আলহামদুলিল্লাহ থেকে অলাদ দোয়াল্লীন পর্যন্ত পড়ে ফেলতেন না। বরং প্রতিটি বাক্যের শেষে বিরতি দিতেন।

কতিপয় লোক কুরআনকে দুনিয়া লাভের উপায় বানিয়ে নেবে

٦٢. عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْعَرَبِيُّ وَالْاَعْجَمِيُّ، فَقَالَ اقْرَأُوْا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُوْنَهُ، وَلَا يَتَاَجَّلُوْنَهُ – (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ) ـ

৬২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন। আমরা তখন বসে কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের মাঝে আরবী ভাষী লোকও ছিল এবং অনারব লোকও ছিল। রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কুরআন পাঠ শুনে বললেনঃ পড়ে যাও, তোমাদের সকলের পাঠই সুন্দর। অচিরেই এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা খুবই শুদ্ধ করে এমন ভংগিতে কুরআন পাঠ করবে যেভাবে তীর লক্ষ্য ভেদ করার জন্য সোজা করা হয় কিন্তু এর দ্বারা তাদের পার্থিব স্বার্থ লাভই হবে উদ্দেশ্য, আখেরাত লাভ তাদের উদ্দেশ্য নয়। (আবু দাউদ, বায়হাকী)।

জাবের (রা) এই যে বললেন, আমাদের মাঝে আরবী ভাষী লোকও ছিল এবং ভিন্ন ভাষাভাষী লোকও ছিল। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের সবাইকে বললেন, পড়ে যাও, সবাই সঠিক পড়ছ—তিনি একথা বলে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, যেহেতু এই জামায়াতে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও গোত্রের লোক ছিল এজন্য তাদের পাঠের ধরনও পৃথক পৃথক ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) তাদের সকলের পাঠের সৌন্দর্য বর্ণনা করলেন। বাহ্যত তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্ভুল পন্থায় সঠিক উচ্চারণে এবং সঠিক ভংগীতে কুরআন পাঠকারী ছিলেননা। আর প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্ঠস্বরও শ্রুতিমধুর ছিল না। তাছাড়া তাদের কারো কারো ভাষা ও উচ্চারণ ভংগীর মধ্যে ত্রুটিও

থাকতে পারে। এজন্য তাদের কুরআন পাঠের পদ্ধতি ও ভংগীর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান থাকাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) তাদের দেখে বললেন, তোমরা সবাই সঠিকভাবে পাঠ করছ এবং তোমরা এই উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করছ যে, তোমরা দুনিয়াতে তদনুযায়ী জীবন যাপন করবে। এজন্য তোমরা সঠিক অর্থে কুরআন পাঠ করার হক আদায় করছ, তোমাদের পাঠ সম্পূর্ণ ঠিক আছে। চাই তোমরা উন্নত পর্যায়ের তাজবীদ শাস্ত্র জান বা না জান এবং কিরাআত পাঠের নীতিমালা অনুযায়ী সঠিক এবং উত্তম পন্থায় তা পাঠ করে থাক বা না থাক। এমন একটি সময় আসবে যখন কুরআন ঠিকই পড়া হবে, তা সঠিক কায়দা-কানুন এবং তাজবীদ শাস্ত্র উত্তম নীতিমালা অনুযায়ী সঠিকভাবে পড়া হবে—যেমন লক্ষ্যবস্তু ভেদ করার জন্য তীর সোজা করা হয়। কিন্তু তাদের এ পাঠের উদ্দেশ্য হবে সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভ করা, আখেরাত লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য হবেনা। অতএব, তাদের এই পাঠ মোটেই কোন কাজে আসবেনা। অবশ্য তোমাদের এই পাঠ একজন সাধারণ গ্রাম্য লোকের পাঠের মতই নিম্ন মানের হোক না কেন—তাই কাজে আসবে। মূলত এই পাঠই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য ও পসন্দনীয় হবে।

গান ও বিলাপের সুরে কুরআন পাঠ করনা

٦٣. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْرَأُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَاَصْوَاتِهَا، وَاِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَسَيَجِيْئُ بَعْدِىْ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْاٰنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ، لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَاْنُهُمْ –

৬৩। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আরবদের স্বরে এবং সুরে কুরআন পাঠ কর। কিন্তু সাবধান, আহলে ইশ্ক এবং দুই আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান) সম্প্রদায়ের স্বরে এবং সুর গ্রহণ করনা। অচিরেই আমার পরে এমন একদল লোকের আগমন ঘটবে যারা গানের সুরে অথবা বিলাপের সুরে কুরআন পাঠ করবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে অতিক্রম করবেনা। তাদের অন্তর দুনিয়ার প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে এবং যারা তাদের পদ্ধতিকে অনুকরণ করবে তাদের অন্তরও। (বায়হাকীর শুআবুল ঈমান এবং রযীন তার গ্রন্থে)।

আরবী স্বরে এবং আরবী সুরে কুরআন পাঠ করার তাকীদ করার অর্থ এই নয় যে, অনারব লোকেরাও আরবদের সুরে এবং স্বরে কুরআন পাঠ করবে। মূলত এ কথার দ্বারা যা বুঝানো উদ্দেশ্য তা হচ্ছে—কোন আরব যখন কুরআন পাঠ করে সে এমনভাবে পাঠ করে যেমন আমরা আমাদের ভাষার কোন বই পড়ে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যখন নিজ ভাষার কোন বই পড়েন তখন আপনি তা ইনিয়ে বিনিয়ে এবং গানের সুরে পাঠ করেন না। বরং নিজের ভাষার বই-পুস্তক যেভাবে পাঠ করার নিয়ম সেভাবেই পাঠ করেন। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহর (স) কথার অর্থ হচ্ছে—কুরআন এমন সহজ সরল ও সভাবগত পন্থায় পাঠ করবে যেভাবে একজন আরবী ভাষী ব্যক্তি তা পাঠ করে থাকে। ইতিপূর্বে রসূলুল্লাহর (স) এই বাণী উল্লেখিত হয়েছে "কুরআনকে তোমাদের উত্তম স্বরে সৌন্দর্যমন্ডিত কর।" অতএব বুঝা যাচ্ছে উত্তম সুরে পড়া এবং আরববাসীদের মত সাদাসিদাভাবে কুরআন পাঠ করার অর্থ একই। কেননা সাদাসিদাভাবে পড়ার অর্থ এই নয় যে, কোন ব্যক্তি বেমানানভাবে এবং ভয়ংকর শব্দে কুরআন পাঠ করবে।

অতপর নবী (স) বলেছেন, সাবধান, আহলে ইশ্‌কের স্বরে কুরআন পাঠ করনা। অর্থাৎ গায়করা যেভাবে মানুষকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে—অনুরূপভাবে কুরআন পাঠ করনা।

অতপর তিনি বলেছেন, অচিরেই এমন লোকের আগমন ঘটবে যারা কুরআনকে গানের সুরে পড়বে অথবা স্ত্রীলোকদের মত বিলাপের সুরে পড়বে। কিন্তু এই পড়া তাদের কণ্ঠনালির নীচে নামবেনা। অর্থাৎ তাদের অন্তর পর্যন্ত কুরআনের আবেদন পৌঁছবেনা। শুধু তাই নয়, বরং তাদের অন্তকরণ দুনিয়াবী চিন্তায় লিপ্ত থাকবে। এবং তাদের অন্তকরণও যারা তাদের পাঠ শুনে দোল খেতে থাকে আর বলে সুবহানাল্লাহ।

নবী (স) এ ধরনের কুরআন পাঠকারী এবং তা শুনে মাথা দোলানো ব্যক্তিদের এজন্য সতর্ক করেছেন যে, এই কুরআন কোন কবিতার বই নয় যে, বসে বসে তা শুনবে আর প্রশংসার স্তবক বর্ষণ করবে এবং মারহাবা মারহাবা প্রতিধ্বনি তুলবে। বর্তমানে আমাদের এখানে কুরআন পাঠের মজলিসে যেমনটা হচ্ছে। কখনো কখনো তো এসব মাহফিলের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যেন কবিতার আসর বসছে আর কি! এই পন্থা ত্রুটি মুক্ত নয়।

সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে

٦٤. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حَسِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ فَاِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْاٰنَ حُسْنًا- (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

৬৪। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা নিজেদের উত্তম কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্য মণ্ডিত কর। কেননা সুমধুর স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। (দারেমী)

এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি হাদীস এসেছে। কোনটিতে যদি গানের সুরে কুরআন পড়তে বাধা দেয়া হয়েছে তাহলে অপরটিতে তা সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে জানা গেল, গানের সুরে পড়া এবং সুমিষ্ট আওয়াজে পড়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, একটি অপছন্দনীয় এবং অপরটি পছন্দনীয়।

সুকণ্ঠে কুরআন পড়ার অর্থ কি

٦٥. عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلاً قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَىُّ النَّاسِ اَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْاٰنِ وَاَحْسَنُ قِرَاءَةً قَالَ مَنْ اِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ اُرِيْتَ اَنَّهُ يَخْشَى اللّٰهَ قَالَ طَاوُسٌ وَكَانَ طَلْقٌ كَذَالِكَ- (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

৬৫। তাউস ইয়ামানী মুরসাল হিসাবে বর্ননা করেন[২], নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তি কুরআনকে উত্তম স্বরে উত্তম পন্থায় পাঠকারী? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তির কুরআন পাঠ শুনে তোমার এমন ধারণা হবে যে, সে আল্লাহকে ভয় করছে। (দারেমী)।

দেখুন, এখানে সুকণ্ঠে কুরআন পাঠ করার অর্থকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন বললেন, কুরআনকে সুমধুর আওয়াজ দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত কর এবং তা সুমিষ্ট স্বরে পাঠ কর, কিন্তু গানের সুরে পড়না—তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করার অর্থ কি? এরপর তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, কুরআনকে এমন

২. হযরত তাউস সাহাবী নন। অতএব তিনি এ হাদীস সরাসরি নবী আলাইহিস সালামের কাছে শুনেননি, বরং কোন সাহাবীর কাছে শুনে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই সাহাবীর নাম তিনি উল্লেখ করেননি।

ভংগীতে পাঠ কর যেন শ্রোতা স্বয়ং অনুভব করতে পারে যে, তুমি খোদাকে ভয় করছ। খোদার ভয়শূন্য হয়ে মানুষ যখন কুরআন পাঠ করে তখন তার অবস্থা ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে হৃদয়ংগম করে এবং খোদার ভয় জাগ্রত রেখে পাঠ করে তার অবস্থা হবে অন্য রকম। সে প্রতিটি জিনিসের প্রভাবকে গ্রহণ করে কুরআন পাঠ করে। তার পাঠের ধরন এবং মুখের ভংগী থেকেই তার এই খোদাভীতির প্রকাশ ঘটে থাকে।

কুরআনকে পরকালীন মুক্তির উপায় বানাও

٦٦. عَنْ عَبِيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَااَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَاتَتَوَسَّدُوْا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَفْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلَاتَعْجَلُوْا ثَوَابَهٗ فَاِنَّ لَهٗ ثَوَابًا-

৬৬। সাহাবী আবীদাহ মুলাইকী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হে আহলে কুরআন (কুরআন পাঠকারীগণ)! কুরআনকে কখনো বালিশ বানাবেনা, বরং দিনরাত তা পাঠ করবে। যেভাবে পাঠ করলে এর হক আদায় হয়—সেভাবে পাঠ করবে। তা প্রকাশ্যভাবে এবং সুললিত কন্ঠে পাঠ করবে। এর মধ্যে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। তার সওয়াব দ্রুত লাভ করতে চেষ্টা করনা। কেননা (আখেরাতে) এর সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। (বায়হাকী)

বলা হয়েছে, 'কুরআনকে বালিশে পরিণত করনা'। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ যেভাবে বালিশের ওপর মাথা রেখে শোয়ার জন্য লম্বা হয়ে পড়ে যায়—অনুরূপভাবে কুরআনকে বালিশের বিকল্প বানিয়ে তার ওপর মাথা রেখে শুয়ে যেওনা। বরং এর অর্থ পরবর্তী বাক্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ কুরআনের প্রতি অমনোযোগী হওনা। এরূপ অবস্থা যেন না হয় যে, নিজের কাছে কুরআন মওজুদ রয়েছে। কিন্তু নিজেই অলসতায় ডুবে রয়েছে এবং কখনো দৃষ্টি উত্তোলন করে এর প্রতি তাকায়না এবং এ থেকে পথনির্দেশ লাভের চেষ্টাও করেনা।

অতপর বলা হয়েছে, 'এই দুনিয়ায়ই কুরআনের সওয়াব দ্রুত লাভ করার চেষ্টা করনা। যদিও এর সওয়াব নিশ্চিতই রয়েছে এবং অবশ্যই তা পাওয়া যাবে।' অর্থাৎ

এই দুনিয়ায় তুমি এর সওয়াব না–ও পেতে পার বরং এর উল্টো কোথাও তুমি এর কারণে শত্রুর কঠোরতার শিকার হয়ে যেতে পার। কিন্তু এর সওয়াব অবশ্যই রয়েছে–যা অবশ্যই আখেরাতে পাওয়া যাবে। পার্থিব জীবনেও কখনো না কখনো এর সওয়াব মিলে যেতে পারে। কিন্তু তোমরা তা পার্থিব সওয়াব লাভের জন্য পড়না বরং আখেরাতের সওয়াব লাভের জন্য পাঠ কর।

প্রাথমিক পর্যায়ে আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন পাঠের অনুমতি ছিল

٦٧. عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَااَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقْرَاَنِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهٖ فَجِئْتُ بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأْ تَنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْسِلْهُ اِقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰكَذَا اُنْزِلَتْ– ثُمَّ قَالَ لِيْ اِقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

৬৭। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামকে (রা) সূরা ফুরকান পাঠ করতে শুনলাম। কিন্তু আমার পাঠের সাথে তার পাঠের গরমিল লক্ষ্য করলাম। অথচ স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সূরাটি আমাকে শিখিয়েছেন। অতএব, আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম। কিন্তু (ধৈর্য ধারণ করলাম এবং) তাকে অবকাশ দিলাম। সে তার কিরাত শেষ

করল। অতপর আমি তার চাদর ধরে তাকে টানতে টানতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে সূরা ফুরকান পাঠ করতে শুনলাম। আপনি এ সূরাটি আমাকে যেভাবে শিখিয়েছেন সে তা অন্যভাবে পাঠ করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাকে ছেড়ে দাও। অতপর তিনি হিশামকে বললেনঃ পড়। সুতরাং আমি তাকে যেভাবে পাঠ করতে শুনেছিলাম ঠিক সেভাবেই সে তা পাঠ করল। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এরূপই নাযিল হয়েছে। অতপর তিনি আমাকে বললেনঃ কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। অতএব যেভাবে পাঠ করা সহজ সেভাবেই পাঠ কর। (বুখারী, মুসলিম)

'সাত হরফে' অর্থ সাত ধরনের উচ্চারণ ভংগী অথবা সাত ধরনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। আরবী ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের পার্থক্য একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। আরবের বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার ভাষার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই পার্থক্যের ধরন এমন নয় যে, তাতে ভাষার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য সূচীত হয়। স্থানীয় বাকরীতি, উচ্চারণ–ভংগী, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাগত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্বেও ভাষার মৌলিক ছাঁচ এক ও অভিন্ন। ভাষার স্থানীয় ঢং এবং পার্থক্যের দৃষ্টান্ত আপনারা এখানেও পেয়ে থাকবেন। সুতরাং আপনি যদি পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় যান তাহলে দেখতে পাবেন এর প্রতিটি জেলা বরং একই জেলার বিভিন্ন অংশে ভাষার বিভিন্নতা রয়েছে। উর্দু ভাষারও একই অবস্থা। পেশওয়ার থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত চলে যান, মাদ্রাজ থেকে তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে যান। উর্দুভাষীগণ একই বিষয় প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন বাকরীতি, উচ্চারণ ভংগী, প্রবাদ বাক্য ইত্যাদি ব্যবহার করে। দীল্লি, লাক্ষ্মৌ, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) এবং পাঞ্জাবে একই উর্দু ভাষায় বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। (বাংলা ভাষার অবস্থাও তদ্রূপ। একই বিষয়বস্তু প্রকাশ করার জন্য কলিকাতা, গৌহাটি এবং ঢাকার বাকরীতি ও উচ্চারণ ভংগীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।))

আরবের আঞ্চলিক ভাষায়ও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমানেও আছে। আরবের উপদ্বীপে আপনি ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত, অথবা ইয়ামন থেকে ইরাক পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তাদের উচ্চারণ ভংগী এবং বাকরীতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকবেন। এই বিষয়বস্তু আরবের এক এলাকায় এক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়, আবার অন্য এলাকায় ভিন্নরূপে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই পার্থক্যের কারণে অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না সুতরাং এই হাদীসে সাত হরফ বলতে এই উচ্চারণ ভংগী, বর্ণনা ভংগী ইত্যাদির পার্থক্য বুঝানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআন শরীফ কতিপয় কোরাইশদের মধ্যে প্রচলিত

বাকরীতিতে নাযিল হয়েছে, কিন্তু আরববাসীদের স্থানীয় উচারণ ভংগী ও বাকরীতিতে তা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। একজন আরবী ভাষী লোক যখন কুরআন পাঠ করে তখন তাষার স্থানীয় পার্থক্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অর্থ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কোন পরিবর্তন সূচীত হয় না। হারাম জিনিস হালাল হয়ে যাওয়া অথবা হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তৌহীদের বিষয়বস্তু শেরেকী বিষয়বস্তুতে পরিবর্তিত হতে পারে না।

কুরআন যতক্ষণ আরবের বাইরে ছড়ায়নি এবং আরবরাই এর পাঠক ছিল এই অনুমতি কেবল সেই যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এই অনুমতি এবং সুবিধা রহিত করে দেয়া হয়। বিভিন্ন উচ্চারণে কুরআন পাঠ করার অনুমতি কেন দেয়া হল তাও বুঝে নেয়া দরকার। এর কারণ ছিল এই যে, তৎকাণীন সময়ে লিখিত আকারে কুরআনের প্রচার হচ্ছিল না। আরবের লোকেরা লেখা-পড়াই জানতনা। অবস্থা এরূপ ছিল যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন লেখাপড়া জানা লোক ছিল। আরবে লেখাপড়ার যা কিছু রেওয়াজ ছিল তা ইসলামের আগমনের পরেই হয়েছে। সুতরাং এ যুগে লোকেরা মুখে মুখে কুরআন শুনে তা মুখস্ত করে নিত। যেহেতু তাদের মাতৃভাষা ছিল আরবী, এজন্য কুরআন মুখস্ত করতে এবং মুখস্ত রাখতে তাদের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। একজন আরব যখন কুরআন শুনত তখন পুরা বিষয়বস্তুই তার মুখস্ত হয়ে যেত। এরপর সে যখন অন্যদের কাছে তা বর্ণনা করত তখন তাষার স্থানীয় পার্থক্যের কারণে তার বর্ননার মধ্যে অনুরূপ ধরনের উচ্চারণগত পরিবর্তন হয়ে যেত। এতে মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য সুচিত হতনা। স্থানীয় বাকরীতি অনুযায়ী তারা যেভাবে পাঠ করত বিষয়বস্তু সেভাবে বর্ণিত হত। এর ভিত্তিতে সেই যুগে আরবদের জন্য নিজ নিজ এলাকার উচারণ ভংগী ও বাকরীতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করার সুযোগ রাখা হয়েছিল।

হযরত উমর (রাঃ) যেহেতু মনে করেছিলেন, তিনি যেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরআন শুনেছেন—ঠিক সেভাবেই প্রত্যেককে তা পাঠ করা উচিত। এজন্য তিনি যখন হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করতে শুনলেন তখন আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। তিনি যত সময় ধরে পাঠ করতে থাকলেন, উমর (রা) নিজ স্থানে ততক্ষণ অস্থির অবস্থায় কাটাতে থাকেন। এদিকে তিনি কুরআন পাঠ শেষ করলেন, ওদিকে উমর (রা) তার চাদর টেনে ধরলেন এবং তাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত করলেন।

এখন দেখুনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেজাজে কি পরিমাণ ধৈর্য, বিনয়, সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য ছিল। তিনি একান্তই প্রশান্ত মনে তার কথা

শুনলেন। তারপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বুঝালেন যে, তোমরা উভয়ে যেভাবে কুরআন পড় তা সঠিক এবং নির্ভুল। আল্লাহ তাআলা দু'ভাবেই তা পাঠ করার অনুমতি দিয়েছেন।

দীনী ব্যাপারে মতবিরোধের সীমা এবং সৌজন্যবোধ

٦٨. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ خِلاَفَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا-

৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন পড়তে শুনলাম। এর পূর্বে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভিন্নভাবে কুরআন পড়তে শুনেছি। আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসলাম এবং তাঁকে জানালাম (এ ব্যক্তি ভিন্ন পন্থায় কুরআন পাঠ করে)। আমি অনুভব করলাম, কথাটা তাঁর মনপূত হলনা। তিনি বললেনঃ তোমরা উভয়ে ঠিকভাবে পাঠ করেছ। পরস্পর মতবিরোধ করনা। কেননা তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি ধ্বংস হয়েছে। -তারা এই মতবিরোধের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। (বুখারী)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে মাসউদকে (রাঃ) বুঝালেন যে, মতভেদ যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, তাতে শিক্ষা অথবা হুকুম পরিবর্তিত হয় না— তাহলে এ ধরনের মতবিরোধ সহ্য করতে হবে। যদি তা না করে তা হলে আপসে মাথা ফাটাফাটিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এভাবে উম্মাতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং বিপর্যয়ের দরজা খুলে যাবে। কিন্তু যেখানে দীনের মূলনীতি অথবা দীনের কোন হুকুম পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে—সেখানে মতভেদ না করাই বরং অপরাধ। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে মতভেদ না করার অর্থ হচ্ছে, দীনের মধ্যে ভাহরীককে (বিকৃতি) কবুল করে নেয়া। এটা আরেক ধরনের বিপর্যয় যার দরজা বন্ধ করে দেয়া স্বয়ং দীনের খাতিরেই প্রয়োজন।

অবিচল ঈমানের অধিকারী সাহাবী
নবীর প্রিয়পাত্র খোদার অনুগৃহীত

٦٩. عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ

يُصَلِّيْ فَقَرَأَ قِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِهٖ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلٰوةَ دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا قَرَاَ قِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَأَ سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِهٖ فَاَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَرَءَ فَحَسَّنَ شَاْنَهُمَا فَسُقِطَ فِيْ نَفْسِيْ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَلَا اِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِيَنِيْ ضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى اللّٰهِ فَرَقًا، فَقَالَ لِيْ يَا اُبَيُّ اُرْسِلَ اِلَيَّ اَنِ اقْرَءِ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِيْ فَرَدَّ اِلَيَّ الثَّانِيَةَ اِقْرَءْهُ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِيْ فَرَدَّ اِلَيَّ الثَّالِثَةَ اِقْرَءْهُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْاَلَةٌ تَسْاَلُنِيْهَا، فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِيْ وَاَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتّٰى اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬১। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামায পড়তে লাগল। সে নামাযের মধ্যে এমনভাবে কিরাআত পাঠ করল যে, আমার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হল। অতপর আরো এক ব্যক্তি আসল। সে এমনভাবে কিরাআত পাঠ করল যে, প্রথম ব্যক্তির কিরাআত থেকে ভিন্নতর ছিল। আমরা নামায শেষ করে সবাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। আমি বললাম, এই ব্যক্তি এমনভাবে কিরাআত পড়েছে যা আমার কাছে সঠিক মনে হয়নি। আর এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও ভিন্ন ধরনের কিরাআত পাঠ করেছে (এটা কেমন ব্যাপার)? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের

উভয়কে (নিজ নিজ পন্থায়) কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তারা কুরআন পাঠ করল। তিনি উভয়ের পাঠকে সঠিক বললেন। এতে আমার অন্তরে মিথ্যার এমন কুমন্ত্রণার উদ্রেক হল যা জাহেলী যুগেও কখনো আমার মনে আসেনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমার এ অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তিনি আমার বুকে সজোরে হাত মারলেন (মিয়া! চেতন হও কি চিন্তা করছ?)। তিনি হাত মারতেই আমি যেন ঘামে ভেসে গেলাম, আমার বুক যেন চৌচির হয়ে গেল এবং ভয়ের চোটে আমার মনে হল যেন আমি স্বয়ং আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি।

অতপর তিনি আমাকে বললেনঃ হে উবাই! আমার কাছে যখন কুরআন পাঠানো হয় তখন আমাকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, আমি যেন তা এক হরফে (একই উচ্চারণ ভংগীতে) পাঠ করি (এবং সেটা ছিল কোরাইশদের উচ্চারণ ভংগী)। আমি প্রতি উত্তরে বললাম, আমার উম্মতের সাথে নমনীয় ব্যবহার করা হোক। অতপর আমাকে দ্বিতীয় বার বলা হয়, দুই হরফে কুরআন পাঠ করতে পার। আমি প্রতি উত্তরে আরজ করলাম, আমার উম্মাতের সাথে নরম ব্যবহার করা হোক। তৃতীয় বারের জবাবে বলা হল, আচ্ছা কুরআনকে সাত রকমের (আঞ্চলিক) উচ্চারণ ভংগীতে পাঠ করতে পার। আরো বলা হল, তুমি যতবার আবেদন করেছ ততবারই জবাব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও তোমাকে তিনটি দোয়া করারও অধিকার দেয়া হল, তুমি তা এখন করতে পার (এবং তা কবুল করা হবে) এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি আরজ করলামঃ "হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে মাফ করে দিন, হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে মাফ করে দিন।" আর তৃতীয় দোয়াটি আমি সেদিনের জন্য রেখে দিয়েছি যেদিন সমগ্র সৃষ্টিকুল আমার শাফায়াত লাভের আশায় চেয়ে থাকবে—এমন কি ইবরাহীম আলাইহিস সালামও। (মুসলিম)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেহায়েত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তিনি প্রবীন এবং প্রাজ্ঞ সাহাবাদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে জানতেন যে, কার মধ্যে কি যোগ্যতা ও কামালিয়াত রয়েছে। হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রাঃ) কামালিয়াত ছিল এই যে, তাকে কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী মনে করা হতো। এই উবাই ইবনে কা'বের (রা) সামনেই এমন ঘটনা ঘটল যে, দুই ব্যক্তি ভিন্ন দুই পন্থায় কুরআন পাঠ করল যা তার জানামতে সঠিক ছিল না। তিনি তাদের উভয়কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির করলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়ের পাঠকেই সঠিক বলে স্বীকৃতি দিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার অন্তরে এক কঠিন এবং মারাত্মক অসওয়াসার (বিভ্রান্তি) উদ্রেক হয়। তা এতই মারাত্মক ছিল যে, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—জাহেলী যুগেও এত জঘণ্য বিভ্রান্তি আমার মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি যা এ সময় আমার মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল। তার মনে যে

সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তা হচ্ছে—এই কুরআন কি খোদার তরফ থেকে এসেছে না কোন মানুষের রচিত জিনিস—যা পাঠ করার ব্যাপারে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হচ্ছে।

অনুমান করুন, এই হাদীসের অর্থ অনুযায়ী এ ধরনের একজন সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীর মনে এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরমগণও মূলত মানুষই ছিলেন, ফেরেশতা ছিলেন না এবং মানবীয় দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত ছিলেন না। তাদের কামালিয়াত ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে থেকে কোন মানুষ যতটা উত্তম ফায়দা উঠাতে পারে তা তারা উঠিয়েছেন। তাঁর প্রশিক্ষণের আওতায় সাহাবাদের এমন একটি দল তৈরী হয়েছিল যে, মানব জাতির ইতিহাসে কখনো এ ধরনের মানুষ পাওয়া যায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তো মানুষই ছিলেন। এজন্য যখন এমন একটি ব্যাপার সামনে আসল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় দুই ব্যক্তির কুরআন পাঠ শুনছেন আর দুটোকেই সহীহ বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, তখন হঠাৎ করে ঐ সাহাবীর মনে এমন খেয়াল আসল যার উল্লেখ হাদীসে হয়েছে।

এখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি দেখুন। মুখমন্ডলের অবস্থা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, তার মনে কি সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। সাথে সাথে তিনি তাকে সাবধান এবং সতর্ক করার জন্য তার বুকে হাত মারলেন,মিয়া! সচেতন হও, কি চিন্তায় মগ্ন হয়েছ?

একথাও বুঝে নেয়া দরকার যে, মনের মধ্যে অসওয়াসা (সংশয়) সৃষ্টি হলেই মানুষ কাফের হয়ে যায় না এবং গুনাহগারও হয়না। অসওয়াসা এমন এক মারাত্মক জিনিস যে, আল্লাহ তাআলা যদি তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে বাঁচার উপায় আছে, অন্যথায় কোন মানুষই তা থেকে বেঁচে থাকতে পারেনা। হাদীস সমূহের বর্ণনায় এসেছে, সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করতেন, হে আল্লাহর রসূল! কখনো কখনো আমাদের মনের মধ্যে এমন সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, তাতে আমাদের মনে হয় আমাদের পরিণতি খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের আখেরাত নষ্ট হয়ে গেছে। একথার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আসল ব্যাপার তা নয় যে, তোমাদের মনে অসওয়াসা আসবেনা। বরং আসল ব্যাপার হচ্ছে তা এসে তোমাদের মনে যেন স্থায়ী হতে না পারে। কোন খারাপ ধারণা মনের ভিতরে সৃষ্টি হয়ে তা শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার দরবারে এজন্য পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যদি নিকৃষ্ট খেয়াল আসার পর তোমরা এটাকে নিজেদের মনে স্থান দাও এবং এর পোষকতা করতে থাক, তাহলে এটা এমন জিনিস যা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে।

হযরত উবাই ইবনে কাবের (রা) মনের মধ্যে একটি ঘৃণ্য এবং বিপর্যয়কর অসওয়াসা সৃষ্টি হল—নবী (সঃ) সাথে সাথেই অনুভব করলেন যে, তার মনে এই

অসওয়াসা এসেছে। এজন্যে তিনি তার বুকে চপেটাঘাত করলেন। তিনি চপেটাঘাত করতেই উবাই (রা) সংবিত ফিরে পেলেন এবং সাথে সাথে তিনি অনুভব করতে পারলেন, আমার মনে কত নিকৃষ্ট অসওয়াসা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, এটা অনুভব করতেই আমার মধ্যে এমন কম্পন সৃষ্টি হল যে, মনে হল আল্লাহ আমার সামনে উপস্থিত এবং ভয়ের চোটে আমার ঘাম ছুটে গেল।

তার এই দ্রুত প্রতিক্রিয়া মূলত তার অবিচল ঈমান ও পূর্ণতার আলামত বহন করে। তার ঈমান যদি এ পর্যায়ের শক্তিশালী না হত তাহলে তার মধ্যে এরূপ কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হতনা।

কোন ব্যক্তির ঈমান যদি মজবুত হয় এবং তার অন্তরে কোন খারাপ অসওয়াসা আসে তাহলে সে কেঁপে যাবে এবং সে দ্রুত নিজের ভ্রান্তি অনুভব করতে পারবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির ঈমানে বক্রতা থেকে থাকে তাহলে তার অন্তরে খারাপ অসওয়াসা আসবে এবং তা তার ঈমানকে কিছুটা ধাক্কা দিয়ে চলে যাবে। অতপর সে নিজের ঈমানের দুর্বলতার কারণে এ ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যাবে। অতপর সেই কুমন্ত্রণা আবারো তার মনে জাগ্রত হবে এবং তার ঈমানকে আর একটা নাড়া দিয়ে চলে যাবে। এমনকি এক সময় তার পুরা ঈমানকেই নড়বড় করে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু মজবুত এবং সবল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির অবস্থা এরূপ হয়না। সে কুমন্ত্রণা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যায়। হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) প্রতিক্রিয়া একথারই সাক্ষ্য বহন করে। হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) সতর্ক হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বুঝানোর জন্য পরিষ্কার করে বললেন, প্রথমে কুরআন মজীদ যখন নাযিল হয় তখন তা কোরাইশদের মধ্যে প্রচলিত বাকরীতি ও উচ্চারণ ভংগী অনুযায়ী নাযিল হয়। এটা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও মাতৃভাষা ছিল। কিন্তু তিনি নিজে আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করলেন যেন তা অন্যরূপ উচ্চারণ ভংগীতেও পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়। আবেদনের ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ "হাব্বেন আলা উম্মাতী—আমার উম্মতের সাথে নম্র ব্যবহার করুন।" তাঁর অনুভূতি ছিল, আমার মাতৃভাষা সারা আরবে প্রচলিত ভাষা নয়, বরং বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী গোত্র সমূহের মধ্যে কিছুটা স্থানীয় বাকরীতিরও উচ্চারণ প্রচলিত আছে। এজন্য সব লোকের জন্য যদি কেবল কোরাইশদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার রীতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয় তাহলে তারা কঠিন পরীক্ষায় নিমজ্জিত হবে। তাই তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করলেন, আমার উম্মাতের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা হোক। সুতরাং প্রথম আবেদনের জবাবে দুই রকম বাকরীতি ও উচ্চারণ ভংগীতে কুআন পাঠ করার অনুমতি দেয়া হল।

নিজ বান্দার সাথে অল্লাহ তায়ালার ব্যবহারও আশ্চর্যজনক। প্রথম দফা দরখাস্তের জবাবে সাত রকম পন্থায় কুরান পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। অথচ সাত রকম পন্থায় পাঠ করার অনুমতি দেয়ারই ইচ্ছা ছিল। এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয়

দফা আবেদন করার অপেক্ষা করলেন। এভাবে একদিকে মনে হয় রসূলুল্লাহকে (স) পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ছিল যে, নবী হিসাবে তাঁর মধ্যে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে কতটা অনুভূতি রয়েছে। এজন্য প্রথমে একক ভংগীতেই কুরআন নাযিল করা হয়। কিন্তু যেহেতু তাঁর মনে এ অনভূতি জাগ্রত ছিল যে, আরবের লোকদের হেদায়েত করাই আমার সর্বপ্রথম দায়িত্ব। আর আরবদের ভাষায় স্থানীয় পার্থক্য বিদ্ধমান রয়েছে। যদি কুরআন মজীদের একটি মাত্র অঞ্চলের বাকরীতি অনুযায়ী পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে লোকেরা কঠিন বিপদে পড়ে যাবে। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজ করলেন, আমার উম্মাতের সাথে নরম ব্যবহার করা হোক। জবাবে দুই আঞ্চলিক রীতিতে তা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হল। তিনি পুনরায় আরজ করলেন, আমার উম্মাতের সাথে আরো নম্র ব্যবহার করা হোক। এভাবে তাঁর দুই দফা আবেদন করার পর সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দেয়া হল। এরপর আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, যেহেতু তুমি আমার কাছে তিনবার দরখাস্ত করেছ এবং আমি তিনবারই জবাব দিয়েছি—এজন্য এখন তোমাকে আমার কাছে অতিরিক্ত তিনটি দোয়া করার অধিকার দেয়া হল। পরম দয়ালূ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দান করার এই ধরন আপনি লক্ষ্য করুন। এ জিনিসটিকেই তিনি কুরআন মজীদে বলেছেন, "রহমাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শাইয়েন—আমার অনুগ্রহ প্রতিটি সৃষ্টির ওপর প্রসারিত হয়ে আছে।" (সূরা আ'রাফঃ ১৫৬)। এই হচ্ছে রহমাতের ধরন যে, তুমি যেহেতু তোমার উম্মাতের সাথে নম্র ব্যবহার করার জন্য আমার কাছে তিনবার আবেদন করেছ–তাই তোমার দায়িত্ব পালনের এ পদ্ধতি আমার পছন্দ হয়েছে। এজন্য তোমাকে এখন আরো তিনটি আবেদন করার অধিকার দেয়া হল। আমি তা কবুল করব।

এখন দেখুন রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইবার দোয়া করে তৃতীয় বারের দোয়াটি আখেরাতের জন্য হাতে রেখে দিয়েছেন। অন্য দুটি দোয়াও তিনি কোন পার্থিব স্বার্থ, ধন দৌলত এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হাসিল করার জন্য করেননি। বরং তিনি দোয়া করলেন, আমার উম্মাতের সাথে ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করা হোক। তিনি বলেছেন, "ইগফির লে-উম্মাতী—আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন।" আরবী 'মাগফিরাত' শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করা, অপরাধ উপেক্ষা করা, অপরাধ দেখেও না দেখা ইত্যাদি। 'মিগফার' বলা হয় এমন শিরস্ত্রাণকে যা মাথাকে ঢেকে রাখে, গোপন করে রাখে। সুতরাং 'ইগফির লে-উম্মাতী' বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে—আমার উম্মতের সাথে ক্ষমা, নম্রতা ও উদারতাপূর্ণ ব্যবহার করা হোক।

একরকম ব্যবহার তো হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি অপরাধ করল এবং দ্রুত তাকে শাস্তি দেয়া হল। আরেক রকম ব্যবহার হচ্ছে এই যে, আপনি অপরাধ করেছেন আর আপনার অপরাধ উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং আপনাকে সতর্ক হওয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আপনি পুনরায় অপরাধ করছেন এবং আপনাকে সংযত হওয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এভাবে পুনপুন আপনার অপরাধ উপেক্ষা করে আপনাকে

সংশোধনের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আপনি যেন শেষ পর্যন্ত সংশোধন হতে পারেন এবং নিজেকে সংযত করতে পারেন।

ঘটনা হচ্ছে, মুসলমান যে জাতির নাম—তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ কালাম কুরআন মজীদ অবিকল মওজুদ রয়েছে। এর মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন প্রকার রদবদল হতে পারেনি। আবার মুসলমানরাই সেই জাতি যাদের কাছে মহানবীর (স) সীরাত, তাঁর বাণী এবং তাঁর পথনির্দেশ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় চলে আসছে। তাদের খুব জানা আছে হক কি এবং বাতিল কাকে বলে। তারা এও জানে, আমাদের কাছে আমাদের প্রতিপালকের দাবী কি। আমাদের প্রিয়নবী (স) আমাদের কোন পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের একটি জাতি যদি ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে নাফরমানী ও অসদাচরণ করে বসে কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদের ডলে-পিষে শেষ করে না দেন—তাহলে এটা তাঁর সীমাহীন রহমাত, বিরাট ক্ষমা ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কি? এক ধরনের অপরাধ তো হচ্ছে, অপরাধী জানতেই পারেনা যে, সে অপরাধ করেছে এবং সে আবারো অপরাধ করে বসল। এ অবস্থায় সে এক ধরনের নম্র ব্যবহার পাওয়ার উপযোগী। কিন্তু এক ব্যক্তির জানা আছে আইন কি? এই আইনের দৃষ্টিতে কোন জিনিসটি অপরাধ তাও তার জানা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আইন ভংগ করে। এর অর্থ হচ্ছে—এই ব্যক্তি কঠোর শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। বর্তমান কালের মুসলমানদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এটাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখুন আজ তের-চৌদ্দশত বছরে আল্লাহ তাআলার ব্যাপক শাস্তি আজ পর্যন্ত মুসলানদের ওপর নাযিল হয়নি। যদিও কোন কোন স্থানে পরীক্ষামূলক ভাবে বিপর্যয় এসেছে তবে অন্য স্থান সামলিয়ে নিয়েছে। এতো সেই দোয়ারই ফল যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করেছিলেন—আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, তাদের অপরাধ উপেক্ষা করুন, তাদের সাথে কঠোরতা না করুন। সুতরাং তাঁর সেই দোয়া বাস্তবিকই কবুল হয়েছে।

এখানে একথাও ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার যে, 'ইগফির লি-উম্মাতী' বাক্যের দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য কখনো এই ছিলনা যে, আমার উম্মাত যে কোন ধরনেরই খারাপ কাজ করুক তা সবই ক্ষমা করে দেয়া হবে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি নিজের কাঁধে বকরী বহন করে নিয়ে আসবে তা ভ্যা ভ্যা রব করতে থাকবে।

সে আমাকে ডাকবে, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইয়া রসূলাল্লাহ!—আমি তাকে কি জবাব দেব? আমি বলব, 'এখন আমি তোমার কোন উপকারে আসবনা। কারণ পূর্বেই আমি তোমার কাছে খোদার বিধান পৌছে দিয়েছি।" অর্থাৎ, তোমরা যদি এমন আপরাধ করে আস যার শাস্তি অবশ্যই পাওয়া উচিত—তাহলে তোমরা আমার শাফাআত লাভের অধিকারী হতে পারবে না। কিয়ামতের দিনের শাফাআতের অর্থ এই নয় যে, সে যেহেতু আমার লোক, সুতরাং দুনিয়াতে জুলুম-অত্যাচার করেই আসুক না কেন জনগণের অধিকার আত্মসাৎ করেই আসুক না কেন কিন্তু তাকে

ক্ষমা করিয়ে দেয়া হবে। আর অন্যরা জুলুম করলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। কিয়ামতের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের অর্থ কখনো এটা নয়।

পঠন–ভংগীর পার্থক্যের কারণে অর্থের কোন পার্থক্য হয় না

٧٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَقْرَاَنِىْ جِبْرِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ ويَزِيْدُنِىْ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِىْ اَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْاَحْرُفَ اِنَّمَا هِىَ فِى الْاَمْرِ تَكُوْنُ وَاحِداً لَاتَخْتَلِفُ فِىْ حَلَالٍ وَّلَاحَرَامٍ –(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জিবরীল (আ) আমাকে প্রথমে এক রীতিতে কুরআন পড়িয়েছেন। অতপর আমি তার কাছে বার বার দাবী তুললাম যে, কুরআন মজীদ ভিন্ন রীতিতেও পাঠ করার অনুমতি দেয়া হোক। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং তা সংখ্যায় সাতরীতি পর্যন্ত পৌঁছল। অধস্তন রাবী ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেন, যে সাত হরফে (রীতি) কুরআন পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে–তা সংখ্যায় সাত হওয়া সত্বেও যেন একটি রীতিরই বিকল্প ব্যবস্থা ছিল। এই একাধিক রীতিতে কুরআন পাঠ করলে (কথা একই থাকে) হালাল–হারামের মধ্যে পরিবর্তন সূচীত হয়না। (বুখারী, মুসলিম)

সাত রীতিতে কুরআন পড়ার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে যখন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে উঠল, তখন এই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি ছিল জনগণকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। কেননা মুসলমান এবং জাহেলিয়াত দুটি জিনিসের একই দর্শণ হতে পারে না। প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র জনগণকে মৌখিক পদ্ধতিতে দীনের শিক্ষা দান করেছে। কিন্তু এর সাথে সাথে গোটা জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। সুতরাং খেলাফতে রাশেদার যুগে এত ব্যাপক আকারে শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজ চলে যে, একটি তথ্যের ভিত্তিতে সে সময় শতকরা একশো জন লোকই

অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা যেন কুরআন পড়তে সক্ষম হয়ে যায় এই লক্ষ্য সামনে থাকায় এরূপ ফল সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ মুসলমানদের দৃষ্টিতে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার সর্বপ্রথম গুরুত্ব এই ছিল না যে, লোকেরা যেন দুনিয়াবী ব্যাপারসমূহ লিখন ও পঠনে পারদর্শী হয়ে যাক। এতো কেবল একটা কর্মগত সুবিধা। আসল ফায়দা এই যে, লোকেরা কুরআন পড়ার যোগ্য হয়ে যায়। যখন তারা কুরআন পড়ার যোগ্য হবে না এবং সরাসরি জানতে পারবে না যে, তার প্রতিপালক তার ওপর কি কি দায়িত্ব আরোপ করেছেন, তাকে কোন্ পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে এবং সে পরীক্ষায় তার কৃতকার্য হওয়ারই বা পথ কি, আর বিফল হওয়ার কারণ সমূহই বা কি—ততক্ষণ তারা একজন মুসলমানের মত জীবন যাপন করার যোগ্য হতে পারবে না। এ জন্য জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা ইসলামী সমাজে মৌলিক গুরুত্বের দাবীদার। ইসলামী খেলাফত এই কাজকে নিজের মৌলিক কর্তব্য বিবেচনা করেই আঞ্জাম দিয়েছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাথমিক যুগেই মদীনা তাইয়্যেবায় শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের ঘটনায় জানা যায়, যখন কোরাইশ গোত্রের লোক বন্দী হয়ে আসল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে লেখাপড়া জানে সে এখানে এতজন বালককে লেখাপড়া শিখাবে। তাহলে কোনরূপ বিনিময় ব্যতিরেকে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। এ থেকেই অনুমান করা যায়, স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে লোকদেরকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

জনগণকে যখন শিক্ষিত করে গড়ে তোলা সম্ভব হল এবং তারা লেখা–পড়ার উপযুক্ত হয়ে গেল, এরপর বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন পড়ার অনুমতি রহিত করে দেয়া হল এবং শুধু কোরাইশদের ভাষার প্রচলন অবশিষ্ট রাখা হয়। কেননা কুরআন মজীদ কোরাইশদের আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল হয়েছিল। এবং যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও মাতৃভাষা ছিল। তাঁর নিয়ম ছিল, যখনই কুরআন মজীদ নাযিল হত, তখন প্রথম অবসরেই তিনি কোন লেখা–পড়া জানা সাহাবীকে ডেকে তা লিখিয়ে নিতেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোরাইশদের মধ্যে প্রচলিত বাকরীতি ছাড়াও প্রথম দিকে আরবের অপরাপর এলাকার বাকরীতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই অনুমতি রহিত করে দেয়া হয়। আর প্রথম থেকেই কুরআন মজীদ কোরাইশদের মধ্যে প্রচলিত অভিধান অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়।

আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পড়ার অনুমতি একটি বিরাট সুযোগ ছিল

৭১. عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ لَقِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ جِبْرِيْلَ فَقَالَ يَاجِبْرِيْلُ اِنِّىْ بُعِثْتُ اِلٰى اُمَّةٍ اُمِّيِّيْنَ مِنْهُـمُ الْعَجُوْزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِىْ لَمْ يَقْرَاْ كِتَابًا قَطُّ قَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ وَاَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا اِلاَّ شَافٍ كَافٍ - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِىِّ قَالَ اِنَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ اَتَيَانِىْ فَقَعَدَ جِبْرِيْلُ عَنْ يَّمِيْنِىْ وَمِيْكَائِيْلُ عَنْ يَّسَارِىْ فَقَالَ جِبْرِيْلُ اِقْرَاُ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ مِيْكَائِيْلُ اِسْتَزِدْهُ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ -

৭১। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলের (আ) সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেনঃ হে জীবরীল! আমি একটি নিরক্ষর উম্মাতের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। এদের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ, কিশোর ও কিশোরী এবং এমন ব্যক্তি যে কখনো পড়া-লেখা করেনি। জিবরীল বললেন, "হে মুহাম্মদ! কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে।" (তিরমিযী)

মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, "জিবরীল (আ) আরো বললেন, কুরআন যেসব রীতিতে নাযিল হয়েছে তা আরোগ্য দানকারী এবং যথেষ্ট।'

নাসাঈর বর্ণনায় আছে-"রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, জিবরীল এবং মীকাইল (আ) আমার কাছে আসলেন। জিবরীল আমার ডানপাশে বসলেন এবং মীকাইল আমার বাঁ পাশে বসলেন। অতপর জিবরীল (আ) আমাকে বললেন, কুরআন মজীদ এক রীতিতে (অর্থাৎ কোরাইশদের মধ্যে প্রচলিত বাকরীতি অনুযায়ী) পাঠ করুন। মীকাইল আমাকে বললেন, আরো এক রীতিতে পাঠ করার অনুমতি.চান। (আমি এই অনুমতি চাইতে থাকলাম)। এমনকি শেষ পর্যন্ত সাত রীতিতে পাঠ করার অনুমতি দেয়া হল। সুতরাং এর প্রত্যেক রীতিই আরোগ্য দানকারী এবং যথেষ্ট।"

প্রত্যেক রীতি নিরাময়কারী ও যথেষ্ট' হওয়ার অর্থ হচ্ছে- এর মধ্যে কোন প্রকারের ভ্রান্তির আশংকা নেই। কোরাইশদের অভিধান অনুযায়ী কুরআন পাঠ যেভাবে আরোগ্য দানকারী এবং যথেষ্ট অনুরূপভাবে অন্যান্য গোত্রের অভিধান

অনুযায়ী তার পাঠ আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট। এর মধ্যে যে কোন গোত্রের অভিধান অনুযায়ী কুরআন পাঠ করলে তাতে কুরআনের মূল উদ্দেশ্য ও অর্থের পরিবর্তন ঘটার কোন আশংকা নেই।

কুরআন পড়ে শুনানোর পারিশ্রমিক নেয়া অবৈধ

٧٢. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى قَاصٍ يَّقْرَاُ ثُمَّ يَسْئَلُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْئَلِ اللّٰهَ بِهٖ فَاِنَّهُ سَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يَّقْرَاُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَسْئَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

৭২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি এক কাহিনীকারের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে কুরআন পড়ছিল আর ভিক্ষা চাচ্ছিল। এ দেখে তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করলেন, অতপর বললেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার যা চাওয়ার আছে তা যেন খোদার নিকট চায়। কেননা অচিরেই এমন এক দল লোকের আবির্ভাব হবে যারা কুরআন পাঠ করবে এবং মানুষের কাছে এর বিনিময় চাইবে (আহমদ, তিরমিযি।)

হাদীসটির বিষয়বস্তু পরিষ্কার। তবুও এখানে একটি কথা খেয়াল রাখা দরকার। কুরআন শরীফ পড়ে তার বিনিময় লওয়া কিংবা নামায পড়িয়ে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও নেহায়েত নিষিদ্ধ কাজ এবং প্রাচীন ফিকাহবিদগণ তা নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন; কিন্তু পরবর্তীকালে এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার ফলে সমসাময়িক কালের ফিকাহবিদনগণ লক্ষ্য করলেন যদি এই জাতীয় কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ রাখা হয় তাহলে মসজিদ সমূহে পাঁচ ওয়াক্তের নিয়মিত আযান ও জামায়াত সহকারে নামায আদায়ের ব্যবস্থা চালু না থাকার এবং কোরআন শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে এবং মসজিদের দেখাশুনা ও তা সজীব রাখার কাজ ব্যাহত হতে পারে। এজন্য তারা একটি বিরাট কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত নিলেন যেসব লোক নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করার অথবা কুরআন শিক্ষা দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে তাদের জন্য পারিশ্রমিক নেয়া জায়েজ। তবুও নীতিগতভাবে একথা স্বস্থানে ঠিকই

আছে যে, কোন আলেম যদি অন্য কোন উপায়ে নিজের সাংসারিক ব্যয়ভার বহন করার জন্য অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সাথে সাথে বিনা পারিশ্রমিকে কোন নির্দিষ্ট মসজিদে নামাযের জামাআতে নিয়মিত ইমামতি করতে সক্ষম হন তাহলে এর চেয়ে ভাল কথা আর কি হতে পারে। যে ব্যক্তি মসজিদের দরজায় বসে জুতা সেলাই করে জীবিকা অর্জন করে এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে ইমামতি করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং কারো কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক গ্রহণ করেনা–আমার মতে এই ইমাম খুবই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। এতদসত্ত্বেও যদি কোনভাবেই তা সম্ভব না হয় এবং সে ধরনের কোন কাজেরও সংস্থান করা না যায়, তাহলে সর্বশেষ উপায় হিসেবে ইমাম সাহেব বেতন গ্রহণ করবেন। মসজিদ কমিটিও ইমাম সাহেবের বেতনের ব্যবস্থা করে মসজিদকে জীবন্ত রাখার ব্যবস্থা করবেন।

কুরআনকে জীবিকা অর্জনের উপায়ে পরিণতকারী অপমানিত

٧٣. عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ يَتَاَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৭৩। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে রুটি রুজি অর্জন করার উদ্দেশ্যে কুরআন পড়ে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, তার চেহারায় কেবল হাড়গোড়ই অবশিষ্ট থাকবে এবং তাতে গোশত থাকবেনা। –(ইমাম বায়হাকী তার 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে এ হাদীস সংকলন করেছেন।)

কোন ব্যক্তির চেহারায় গোশত না থাকার অর্থ হচ্ছে সে অপমানিত হবে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি অমুক ব্যক্তি বে–আব্রু হয়ে পড়েছে। শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে চেহারার সৌন্দর্য। সুতরাং কারো অপমানিত হওয়ার ব্যাপারটি আমরা অনেক সময় বলে থাকি "তার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে।" অর্থাৎ তার আসল চেহারা ধরা পড়ে গেছে এবং লোক সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। অতএব, চেহারায় গোশত না থাকাটা 'লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন পড়াকে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উপায়ে পরিণত করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানিত করবেন।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম 'দুই সূরাকে পৃথককারী

٧٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَةِ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – (رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ)

৭৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিলনা যে, এক সূরা কোথায় শেষ হয়েছে। এবং অপর সূরা কোথা থেকে শুরু হয়েছে। অবশেষে তাঁর ওপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নাযিল হল। (আবু দাউদ)

অর্থাৎ, সূরা সমূহের সূচনা এবং সমাপ্তি নির্ণয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অসুবিধার সম্মুখীন হলেন, আল্লাহ তাআলা তখন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' নাযিল করে বলে দিলেন, যেখানে উল্লেখিত বাক্য শুরু হয়েছে সেখানে একটি সূরা শেষ হয়েছে এবং অপর সূরা শুরু হয়েছে। এভাবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' আয়াতটি মূলত সূরা সমূহের মাঝে সীমারেখা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা সমূহের সূচনা ও সমাপ্তি নির্দেশ করার জন্য এ আয়াত নাযিল করেন। এ তাসমিয়া কুরআন মজীদে সূরা 'নামল'–এর একটি আয়াত (৩০) হিসাবেও নাযিল হয়েছে। সাবা রাজ্যের রাণী তার সভাসদগণকে বললেন, আমার নামে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের একটি চিঠি এসেছে। তা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বাক্য দ্বারা শুরু হয়েছে (ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম) সেখানে এটা ঐ সূরার আয়াত হিসাবে নাযিল হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা এটাকে সূরা সমূহের মধ্যে সীমা রেখা হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

এখন এই তাসমিয়া দ্বারা প্রতিটি সূরা শুরু হয়। অবশ্য একটি ব্যতিক্রম আছে। তা হচ্ছে সূরা তওবার সূচনায় বিসমিল্লাহ নেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লামের লেখান যে পান্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল তাতে সূরা তওবার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ ছিল না। এ জন্য সাহাবাগণ তা অনুরূপভাবেই নকল করেছেন। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে তাতে বিসমিল্লাহ সংযোজন করেননি।

এ থেকে আপনারা অনুমান করতে পারেন, সাহাবায়ে কেরাম কুরআন মজীদকে গ্রন্থাকারে সংকলন করার সময় কতটা দায়িত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের জানা ছিল যে, সূরা সমূহকে পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য প্রতিটি সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ লেখা হয়েছিল। তারা এর ওপর অনুমান করে তওবার সূচনায় তা লিখে

দিতে পারতেন। অথবা এরূপ ধারণাও করতে পারতেন যে, সম্ভবত এই সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ লেখানোর খেয়াল তাঁর নাও থাকতে পারে। অথবা যে সাহাবীকে দিয়ে তিনি অহী লেখাতেন হয়ত তিনি তা লিখতে ভুলে গিয়ে থাকবেন; বরং এ ধরনের কোন ভিত্তিহীন কিয়াসের আশ্রয় না নিয়ে তারা নবী আলাইহিস সালামের লেখানো মাসহাফ যেভাবে পেয়েছেন হুবহু সে ভাবেই নকল করেছেন। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে এর মধ্যে একটি বিন্দুও সংযোজন করেননি।

এটা আল্লাহ তায়ালার এক মহান অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর কিতাবের হেফাজতের জন্য এই অতুলনীয় ব্যবস্থা করেছেন। দুনিয়ায় বর্তমানে এমন কোন আসমানী কিতাব নেই যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার বাণী তার আসল অবস্থায় এবং কোন মিশ্রণ ও রদবদল ছাড়া এভাবে সংরক্ষিত আছে। এই মর্যাদা কেবল কুরআন মজীদেরই রয়েছে।

সাহাবাগন কতটা দায়িত্ব নিয়ে কুরআন মুখস্ত করেছেন

৭৫. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مَّا هٰكَذَا اُنْزِلَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَرَأْتُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحْسَنْتَ ، فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ اِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ اَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْه) ـ

৭৫। (তাবেঈ) আলকামা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা (সিরিয়ার) হেমস নগরীতে ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূরা ইউসুফ পাঠ করলেন। সেখানে উপস্থিত একব্যক্তি বলল, এটা এভাবে নাযিল হয়নি। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, খোদার শপথ! আমি এ সূরা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে পড়েছি। আমার পাঠ শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "তুমি ঠিকভাবে পড়েছ।" আবদুল্লাহ (রা) লোকটির সাথে কথা বলছিলেন, এ সময় তিনি তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তিনি বললেন, তুমি শরাব পান করেছ আর কুরআন শুনে তা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চাচ্ছ? অতএব তিনি তার ওপর (মদ পানের অপরাধে) শাস্তির দন্ড কার্যকর করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসটি এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে—সাহাবাদের মধ্যে যারা লোকদের কাছে কুরআন পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছেন—তারা হয় সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে তা মুখস্ত করেছেন, অথবা অন্যের কাছে শুনে মুখস্ত করে তা আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়েছেন। তিনি তা শুনার পর এর সমর্থন করেছেন যে, তুমি সঠিক মুখস্ত করেছ। এভাবে আমাদের কাছে কুরআন পৌঁছানোর কোন মাধ্যম এরূপ ছিলনা যে সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ করার অবকাশ থাকতে পারে।

কুরআন মজীদ কিভাবে একত্রে জমা করা হয়েছিল

٧٦. وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَاِذَا عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِىْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّىْ اَخْشٰى اِنْ اِسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيْرٌمِّنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ، قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَّمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِىْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِذٰلِكَ وَرَاَيْتُ فِىْ ذٰلِكَ الَّذِىْ رَاٰى عُمَرُ، قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِىْ نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَاكَانَ اَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا اَمَرَنِىْ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، فَقَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَّمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِىْ حَتّٰى

شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِیْ لِلَّذِیْ شَرَحَ لَهُ صَدْرَ اَبِیْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰی وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ اَبِیْ خُزَیْمَةَ الْاَنْصَارِیِّ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَیْرِهٖ : لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ حَتّٰی خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِیْ بَكْرٍ حَتّٰی تَوَفَّهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَیَاتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ)

৭৬। যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সময় ইয়ামামার যুদ্ধে অসংখ্য সাহাবা শহীদ হলেন, আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হয়ে দেখলাম উমরও (রা) সেখানে হাযির আছেন। আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, উমর আমার কাছে এসেছে এবং সে বলছে–"ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অসংখ্য কারী (যাদের কুরআন মুখস্ত ছিল এবং লোকদের তা পড়ে শুনাতেন) শহীদ হয়ে গেছেন। আমার আশংকা হচ্ছে– অন্যান্য যুদ্ধেও যদি কুরআনের কারীগণ শহীদ হয়ে যায়, তাহলে কুরআনের বিরাট অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এজন্য আমার রায় হচ্ছে এই যে, আপনি কুরআনকে একত্রিত (বইয়ের আকারে গ্রন্থাবদ্ধ) করার নির্দেশদেন।"

আবু বকর (রা) বলেন, আমি উমরকে বললাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ করেননি তা তুমি কিভাবে করবে? উমর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ' এটা খুবই ভাল কাজ। সে এব্যাপারে আমাকে বরাবর পীড়াপীড়ি করতে থাকল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা–এ কাজের জন্য আমার অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিলেন। (অর্থাৎ আমি আশ্বস্ত হলাম যে,এটা খুবই উপকারী কাজ এবং তা একটি শরঈ প্রয়োজনকে পূর্ণ করবে।) আমার অভিমতও উমরের অভিমতের সাথে মিলে গেল।

যায়েদ (রা) বলেন, অতপর আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, "তুমি একটি যুবক বয়সের লোক এবং বুদ্ধিমান। তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই (অর্থাৎ তুমি যে কোন দিক থেকে নির্ভরযোগ্য)। তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী লেখারা কাজেও নিয়োজিত ছিলে। অতএব তুমি কুরআন মজীদের অংশগুলো খুজে বের কর এবং একত্রে জমা কর।" যায়েদ (রা) বলেন,

আল্লাহর শপথ! তিনি যদি আমাকে পাহাড় তুলে আনার হুকুম দিতেন তাহলে এটা আমার কাছে এতটা কঠিন মনে হতনা– যতটা কঠিন মনে হচ্ছে তার এই কাজের নির্দেশ। আমি আরজ করলাম, আপনি একাজ কেমন করে করবেন যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি? আবু বকর (রা) আমাকে জবাব দিলেন, আল্লাহর শপথ এটা বড়ই ভাল কাজ।

অতপর আবু বকর (রা) এ কাজের জন্য আমাকে বারবার তাগাদা দিতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিলেন–যার জন্য তিনি আবু বকর (রা) ও উমরের (রা) অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অতপর আমি কুরআন মজীদকে খেজুরের বাকল, সাদা পাথরের পাত এবং লোকদের বুক (স্মৃতি) থেকে তালাশ করে করে একত্রে জমা করা শুরু করে দিলাম। অবশেষে আমি সূরা তওবার শেষ আয়াত আবু খুবাইমা আনসারীর (রা) কাছে পেলাম। তা আর কারো কাছে পেলাম না। আয়াতটি হচ্ছে–"লাকাদ জা–য়াকুম রসূলুম–মিন্আনফুসিকুম........." শেষ পর্যন্ত।

এভাবে কুরআন মজীদের যে সহীফা একত্রিত করা হল অথবা লেখা হল তা হযরত আবু বকরের (রা) জীবদ্দশা পর্যন্ত তার কাছে থাকে। অতপর তা হযরত উমরের কাছে তার জীবনকাল পর্যন্ত থাকে। অতপর তা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার যিমমায় থাকে–(ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

হযরত আবু বকরের (রা) মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কুরআন মজীদ একত্রে জমা করা যদি কোন জরুরী কাজ হত এবং দীনের হেফাজতের জন্য এটা করার প্রয়োজন হত তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তাঁর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদকে একত্রিত করে পুস্তকের আকারে সংকলিত করিয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি যখন একাজ করেননি তখন আমরা তা করার দুঃসাহস কি করে করতে পারি? কিন্তু হযরত উমরের (রা) যুক্তি ছিল এই যে, কোন একটি কাজ যদি উত্তম বলে বিবেচিত হয় এবং শরীআত ও ইসলামের মৌলিক দাবীর অনুকূল হয়, তাহলে এর শরঈ প্রয়োজন থাকা এবং তা স্বয়ং একটি ভাল ও কল্যাণকর কাজ হওয়া এবং এর বিপক্ষে কোন নিষেধাজ্ঞা বর্তমান না থাকাটাই সেই কাজ জায়েয হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এজন্যই তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমার দৃষ্টিতে এ কাজ উত্তম।

"খোদার শপথ! তিনি যদি আমাকে পাহাড় তুলে নিয়ে আসার নির্দেশ দিতেন তাহলে একাজ আমার কাছে এত কঠিন মনে হতনা, যতটা কঠিন মনে হচ্ছে তার এই কাজের নির্দেশ"–হযরত যায়েদের (রা) এই মন্তব্য তার তীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করে যে, কুরাআন একত্রে জমা করা একটি কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

কুরআন মজীদকে বিভিন্ন জায়গা থেকে একত্রিত করা, অতপর তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত ক্রমানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা এবং তাতে কোনরূপ ভুল–ভ্রান্তি না হওয়া মূলতই এক কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজ ছিল। "আমার দ্বারা যদি বিন্দু পরিমাণও ভুল হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে কুরআন ভ্রান্তি সহকারে পৌছার সমস্ত দায়দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হবে'–হযরত যায়েদের (রা) মনে এ অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্ধমান ছিল। এই অনুভূতির কারণেই তিনি বলেছেন, পাহাড় উত্তোলন করে নিয়ে আসার চেয়েও অধিক কঠিন কুরআন সংকলনের এই বোঝা আমার ওপর চাপানো হয়েছে।

এ হাদীস থেকে জানা যায়, তিনটি উৎস থেকে কুরআন মজীদ সংগ্রহ করা হয়েছে।

একটি উৎস এই ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরআন মজীদ লিখিয়েছিলেন তা খেজুর বাকল, সাদা পাথরের পাতলা তক্তির ওপর লেখা ছিল। রসূলুল্লাহর (স) নীতি ছিল– যখন অহী নাযিল হত, তিনি লেখাপড়া জানা কোন সাহাবীকে ডেকে তাকে নির্দেশ দিতেন–এই সূরাটি অথবা এই আয়াতগুলো অমুক অমুক স্থানে লিখে দাও। এই সাহাবীদের কাতিবে অহী বা অহী লেখক বলা হত। লেখা শেষ হলে তিনি আবার তা পড়িয়ে শুনতেন যাতে এর নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। অতপর তা একটি থলের মধ্যে ঢেলে দিতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে (সামনের হাদীসে আসছে) এও বলে দিয়েছেন যে, অমুক আয়াত অমুক সূরার অংশ এবং অমুক আয়াতের পরে এবং অমুক আয়াতের পূর্বে সংযোজিত হবে। অনুরূপভাবে সূরা সমূহের ক্রমবিন্যাসও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করে দিয়েছেন। এতে লোকেরা জানতে পারল যে, সূরাগুলোর ক্রমবিন্যাস কিভাবে করা হয়েছে। কিন্তু তিনি কুরআন মজীদকে একটি পুস্তকের আকারে লিখাননি–যে আকারে আজ তা আমাদের সামনে রয়েছে।

হযরত যায়েদ (রা) বলেন, এই থলের মধ্যে পাথরের যেসব তক্তি এবং খেজুর বাকল ছিল আমি তা বের করে নিলাম। এর সাথে আরো একটি কাজ এই করলাম যে, যেসব লোকের কুরআন মুখস্ত ছিল তাদের ডেকে তাদের পাঠ পাথর ও বাকলে লেখা কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখলাম। এভাবে দুইটি উৎসের সাথে কুরআনের আয়াতগুলোর সামঞ্জস্য নির্নিত হওয়ার পর তা একটি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হল।

হযরত যায়েদ (রা) যে বলেছেন, সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত আমি কেবল হযরত খুযাইমা আনসারীর (রা) কাছে পেয়েছি–এর অর্থ এই নয় যে, এই আয়াত ঐ থলের পাণ্ডুলিপির মধ্যেই ছিল না। কেননা এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, এই থলের

মধ্যে যা কিছু পাওয়া যায় তা হাফেজদের মুখস্ত কুরআনের সাথে মিলানোর পর লেখা হবে। অতএব তার কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, আমি কুরআনের যে কয়জন হাফেজ পেলাম, তাদের মধ্যে সূরা তওবার এই শেষ আয়াত কেবল খুযাইমা আনসারীর (রা) মুখস্ত ছিল। আমি থলের পান্ডুলিপির সাথে মিলানোর পর তা সংকলন করলাম।

মাসহাফে উসমানী কিভাবে প্রস্তুত করা হয়

٧٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلٰى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِىْ اَهْلَ الشَّامِ فِىْ فَتْحِ اَرْمِـنِيَّةَ وَاٰذَرْ بِيْجَانَ مَعَ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاَفْـزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلاَفُـهُمْ فِـى الْقِرَاءَةِ فَـقَالَ حُـذَيفَـةُ لِعُثْمَانَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَدْرِكْ هٰذِهِ الْاُمَّــةَ قَبْلَ اَنْ يَّخْتَلِفُوْا فِــى الْكِتٰبِ اِخْتِلاَفَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَـاَرْسَلَ عُـثْمَانُ اِلـى حَفْصَةَ اَنْ اَرْسِلِىْ اِلَيْنَابِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِى الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا اِلَيْكِ فَاَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ اِلـى عُـثْمَانَ فَاَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْـنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْـنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللّٰهِ ابْـنَ الْحَارِثِ بْـنِ هِشَامٍ فَنَسَخُـوْهاَ فِـى الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرُشِـيِّنَ الثَّلاَثِ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا حَتّٰى اِذَا اَنْسَخُوْا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُـثْمَانُ الصُّحُفَ اِلـى حَفْصَةَ وَاَرْسَلَ اِلـى كُلِّ اُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِـمَّا نَسَخُوْا وَاَمَـرَ بِهَا سِـوَاهُ مِنَ الْقُـرْاٰنِ فِـىْ كُلِّ صَحِـيْفَـةٍ اَوْ مُصْحَفٍ اَنْ يُّحْرِقَ ، قَالَ ابْـنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِـىْ خَارِجَـةُ بْنُ

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ اٰيَةً مِّنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنٰهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ نِ الْاَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَاَلْحَقْنَهَا فِيْ سُوْرَتِهَا فِى الْمُصْحَفِ –

(رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আসলেন। এটা সেই যুগের কথা যখন তিনি সিরিয় বাহিনীর সাথে আরমেনিয়া বিজয়ে এবং ইরাক বাহিনীর সাথে আযারবাইজান বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। লোকদের বিভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠ হযরত হুযাইফাকে (রা) উদ্বিগ্ন করে তুলল। তাই তিনি হযরত উসমানকে (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ন্যায় আল্লাহর কিতাবে বিভেদ সৃষ্টির পূর্বে আপনি এই জাতিকে রক্ষা করার চিন্তাভাবনা করুন।

অতএব হযরত উসমান (রা) হযরত হাফসাকে (রা) বলে পাঠালেন, আপনার কাছে কুরআন শরীফের যে সহীফা (অর্থাৎ মাসহাফে সিদ্দিকী) রয়েছে তা আমাকে পাঠিয়ে দিন। আমরা এটা দেখে আরো কপি নকল করিয়ে দেব। অতপর মূল কপি আপনাকে ফেরত দেব। হযরত হাফাসা (রা) মাসহাফ খানি (পুস্তকাকারে সংকলন) হযরত উসমানের (রা) কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অতপর তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা), হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে হিশাম (রা) এই চার ব্যক্তিকে একাজে নিযুক্ত করলেন। তারা মাসহাফে সিদ্দিকী থেকে আরো কয়েকটি মাসহাফ তৈরী করবেন। উপরন্তু এই চার ব্যক্তির মধ্যে কোরাইশ বংশের তিন ব্যক্তিকে (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, সাঈদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে হারিস) তিনি নির্দেশ দিলেন, যদি কখনো কুরআনের কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের সাথে যায়েদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তোমরা কুরআনকে কোরাইশদের বাকরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করবে। কেননা তা এই রীতিতে নাযিল হয়েছে।

তারা তাই করলেন। যখন তারা পুস্তকাকারে কুরআনের নতুন সংকলন তৈরীর কাজ শেষ করলেন হযরত উসমান (রা) মাসহাফে সিদ্দিকী হযরত হাফসার (রা) কাছে ফেরত পাঠালেন। তিনি কুরআনের এক একটি সংকলন ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন, এই সংকলন ছাড়া আর যত সংকলন রয়েছে তা যেন আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

অধস্তন রাবী ইবনে শিহাব (যুহরী) বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিতের পুত্র খারিজা আমাকে বলেছেন, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, আমরা যখন এই মাসহাফে উসমানী সংকলন করছিলাম তখন আমি সূরা আহযাবের একটি আয়াত খুঁজে পাচ্ছিলাম না যা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পড়তে শুনেছি। আমি এ আয়াতের খোঁজে লেগে গেলাম। তা খুযাইমা ইবনে সাবিত আনসারীর (রা) কাছে পাওয়া গেল। আয়াতটি হচ্ছেঃ "মিনাল মু'মিনীনা রিজালুন সাদাকূ মা আহাদুল্লাহা আলাইহি........"। অতএব আমরা তা এই মাসহাফে উল্লেখিত সূরায় সংযোজন করলাম–(বুখারী)

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের (রা) শংকিত হওয়ার কারণ ছিল এই যে, লোকদেরকে যেহেতু নিজ নিজ আঞ্চলিক রীতিতে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল–এজন্য পরবর্তীকালে যখন বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং আরবের বিভিন্ন এলাকার লোকেরা এসে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করতে যায় সেখানে তাদের মধ্যে কুরআনের পাঠ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। এই অবস্থা দেখে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি শংকিত অবস্থায় উসমানের (রা) কাছে এসে হাযির হন। তিনি তাকে বললেন, আপনি এই উম্মাতের কথা চিন্তা করুন। তা না হলে তাদের মধ্যে কুরআনকে নিয়ে এমন কঠিন মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যাবে–যেরূপ তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব নিয়ে পর্যায়ক্রমে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং উসমান (রা) বিষয়টির নাজুকতাকে সামনে রেখে কুরআনের একটি নিখুঁত সংকলন তৈরী করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অতপর উসমান (রা) এই সংকলনকে অবশিষ্ট রেখে বাকি সব সংকলন জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ এজন্য দিলেন যে, লোকেরা যখন লেখা এবং পড়ার উপযুক্ত হয়ে গেল তখন তারা নিজ নিজ গোত্রের বাকরীতি অনুযায়ী কুরআন শরীফ লিখেও নিয়েছিল। তাদের এই সংকলন গুলো যদি পরবর্তীকালে সংরক্ষণ করা হত তাহলে হযরত উসমানের তত্ত্বাবধানে তৈরীকৃত এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত সংকলনের সাথে বিরোধ দেখা দিত। বিভিন্ন রকম সংশয়ের সৃষ্টি হত। এজন্য যার যার কাছে লিখিত কুরআন বা তার অংশ বিশেষ, এমনকি কোন আয়াত ছিল তাও তাদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সাথে সাথে এই মর্মে সরকারী নির্দেশ জারি করা হয় যে, সরকারী তত্ত্বাবধানে কুরআনের যে সংকলন তৈরী করা হয়েছে,

এটাই এখন আসল নোসখা হিসাবে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কুরআনের নিজস্ব কপি তৈরী করতে চায় সে এই সরকারী নোসখা দেখেই তা তৈরী করবে। এভাবে ভবিষ্যতের জন্যে কুরআন মজীদের লেখন ও পঠন মাসহাফে উসমানীর ওপর সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এবং অবশিষ্ট পান্ডুলিপি গুলো ধ্বংস করে দেয়া হয়।

যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন, সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি কেবল খুযাইমা আনসারীর (রা) কাছে পেয়েছি। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, হযরত আবু বকরের (রা) যুগে যে মাসহাফ লেখা হয়েছিল–মনে হয় এর কাগজ খুব শক্ত ছিল না। খুব সম্ভব ঐ আয়াতটি দুর্বল কাগজে লিপিবদ্ধ ছিল। মাসহাফে উসমানী নকল করার সময় পরিষ্কার ভাবে তার পাঠোদ্ধার করা যায়নি। তাই এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাছাড়া আরো লক্ষ্য করার বিষয়, যায়েদ ইবনে সাবিতের (রা) যদিও স্মরণ ছিল যে, উল্লেখিত আয়াতটি সূরা আহযাবের নির্দিষ্ট স্থানে ছিল, কিন্তু তবুও তিনি এমন কোন ব্যক্তির খোজ করা প্রয়োজন মনে করলেন যার এ আয়াত মুখস্ত আছে। তাতে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, এ আয়াতটি মূলত কুরআন মজীদেরই অংশ। খোজ করতে গিয়ে তিনি এ আয়াতটি খুযাইমা আনসারীর কাছে পেয়ে গেলেন। অতএব তিনি তা লিখে নিলেন।

কুরআন শরীফ লিখন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সাহাবাদের কঠোর সতর্কতা অনুমান করুন। স্বয়ং যায়েদের (রা) এ আয়াত মুখস্ত ছিল এবং তিনি নিজেই মাসহাফে সিদ্দিকীতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার এও মনে আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কেবল নিজের স্মৃতির ওপর নির্ভর করে তা কুরআনের অন্তর্ভূক্ত করে নেননি–যতক্ষণ অন্তত একজন স্বাক্ষী এর স্বপক্ষে পাওয়া না গেছে।

সূরা সমূহের ক্রমবিন্যাস রসূলুল্লাহ (স) করেছেন

٧٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَاحَمَلَكُمْ عَلَى اَنْ عَمَدْتُمْ اِلَى الْاَنْفَالِ وَهِىَ مِنَ الْمَثَانِىْ وَاِلَى بَرَاءَةٍ وَهِىَ مِنَ الْمِئِيْنَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوْا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُمُوْهَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَاْتِىْ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ فَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَىْءٌ

دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُوْلُ ضَعُوْا هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا فَاِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْاٰيَةُ فَيَقُوْلُ ضَعُوْا هٰذِهِ الْاٰيَةَ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنْ اَوَائِلِ مَانَزَلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ اٰخِرِ الْقُرْاٰنِ نُزُوْلًا وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ اَكْتُبْ سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ -

৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমানকে (রা) বললাম, কি ব্যাপার, আপনি যে সূরা আনফালকে সূরা তওবার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন? অথচ সূরা আনফালের আয়াত সংখ্যা হচ্ছে ৭৫ এবং সূরা তওবার আয়াত সংখ্যা একশতের অধিক। (আর যেসব সূরার আয়াতসংখ্যা শতের অধিক সেগুলো কুরআন শরীফের প্রথম দিকে রাখা হয়েছে। তাছাড়া আপনি এই সূরা দুটির মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখেননি। আপনি সূরা আনফালকে প্রথম দিককার বৃহৎ সাতটি সূরার অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন– এর কারণ কি? অথচ এর আয়াত সংখ্যা একশোরও কম)

উসমান (রা) জবাবে বললে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি এই ছিল যে, লম্বা সূরা সমূহ নাযিল হওয়ার যুগে যখন তাঁর ওপর কোন আয়াত নাযিল হত তিনি তাঁর কোন কাতিবকে ডেকে বলতেনঃ যে সূরায় এই এই বিষয় আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে এই আয়াত লিখে রাখ। এভাবে যখন কোন আয়াত তাঁর ওপর নাযিল হত, তিনি বলতেনঃ এ আয়াতটি অমুক সূরার সংযোজন কর যাতে এই এই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সূরা আনফালও মদীনা তাইয়েবায় প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। (বদরের যুদ্ধের পরে এই সূরা নাযিল হয়)। আর সূরা বারাআত (তওবা) মাদানী যুগের শেষদিকে নাযিল হওয়া সূরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই সূরা দুটির বিষয়বস্তুর মধ্যে যদিও সামঞ্জস্য রয়েছে কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় আমাদেরকে পরিষ্কার ভাবে একথা বলেননি যে, সূরা

আনফাল সূরা তওবারই একটি অংশ। এজন্য আমি এই সূরা দুটিকে পৃথক পৃথক এবং পাশাপাশি রেখেছি এবং এর মাঝখানে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম লিখিনি। এটাকে আমি বৃহত সাতটি সূরার অন্তর্ভূক্ত করেছি।–(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ–"এই আয়াতকে অমুক সূরার অন্তর্ভূক্ত কর যার মধ্যে অমুক বিষয় আলোচিত হয়েছে"–এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, তিনি নিজেই সূরা সমূহের নামকরণ করেছেন, তিনি বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে এর নামকরণ করেননি। অথচ বিভিন্ন সূরার নাম কেবল (সূরার) নিদর্শন হিসাবেই রাখা হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় সূরার নাম "আল–বাকারাহ" রাখার কারণ এই নয় যে, তাতে গাভীর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বরং এটা কেবল এজন্য রাখা হয়েছে যে, এই সূরার এক স্থানে গাভীর উল্লেখ আছে।

এ হাদীস থেকে দ্বিতীয় যে কথা জানা যায় তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় সূরাগুলোর ক্রমিক বিন্যাস করতে থেকেছেন। অপর একটি হাদীস থেকে জানা যায়–তিনি এও বলতেন, "এই আয়াতকে অমুক আয়াতের পূর্বে এবং অমুক আয়াতের পরে (দুই আয়াতের মাঝখানে) সংযোজন কর।" এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই এক একটি সূরার ক্রমিক বিন্যাসও সম্পন্ন করা হয়েছিল এবং তা পূর্ণাংগভাবে লিখেও রাখা হয়েছিল। যখন নামাযে কুরআন মজীদ পাঠ করা হত তখন এর কোন ক্রমবিন্যাস ছাড়া তা পড়াও সম্ভব ছিল না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ক্রমিক ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন সূরা লেখাতেন, সেই ক্রমিকতা অনুযায়ী তা পড়া হত। আর সেই ক্রমধারা অনুযায়ী লোকেরা তা শুনত।

সূরা আনফাল এবং সূরা তওবার মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রয়েছে। উভয় সূরার মধ্যেই জিহাদের আলোচনা এসেছে। দুই সূরাই একই ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। উভয় সূরায়ই কাফের ও মোনাফিকদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। দুটি সূরাতেই জিহাদের বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং আমাদেরকে জিহাদে যোগদান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে দুটি সূরার মাঝে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

এই সূরা দুটিকে পৃথক পৃথক ভাবেও রাখা হয়েছে। কিন্তু সূরাদ্বয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ ব্যাপারে হযরত উসমানের (রা) ভাষ্য হচ্ছে–বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে এই সূরা দুটিকে পরস্পর পাশাপাশি রাখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা একই সূরায় পরিণত করা হয়নি। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় পরিষ্কার ভাবে একথা

বলেননি যে, এ দুটি একই সূরা, তাছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লেখানো পান্ডুলিপিতে সূরা তওবার প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লেখা পাওয়া যায়নি–এজন্য মাসহাফে উসমানীতেও তা লেখা হয়নি। বর্তমানেও আপনারা কুরআন শরীফ পাঠ করছেন–একটি সূরা শেষ করে অপর সূরা শুরু করছেন–কিন্তু এ সূরা দুটোর মাঝখানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লেখা নাই। এ থেকে আপনারা অনুমান করতে পারেন সাহাবায়ে কেরাম কতটা দায়িত্ব নিয়ে কুরআন মজীদ সংকলন করেছেন। যেহেতু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে লেখানো পান্ডুলিপিতে যে সূরা তওবা পাওয়া গেছে তার সাথে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' নেই (যেমন আমরা হাদীস থেকে জানতে পাই) এ কারণে মাসহাফে উসমানীতেও এই সূরার সাথে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লেখা হয়নি।